দাম : বারো টাকা

জানুয়ারির প্রথম দিনটি বাঙ্গালির
চৈতন্য জাগরণের দিন
— পৃঃ ২৩

স্বস্তিকা

হিন্দু সমাজ সতর্ক হলেই
ঘটবে চৈতণ্যের জাগরণ
— পৃঃ ২৮

৭৪ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা।। ২৭ ডিসেম্বর, ২০২১।। ১১ পৌষ- ১৪২৮।। যুগাব্দ - ৫১২৩।। website : www.eswastika.com

কল্পতরু উৎসব

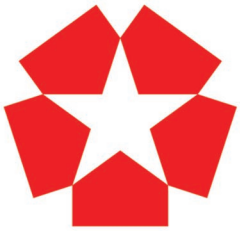

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE™ NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555

E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ১৬ সংখ্যা, ১১ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

২৭ ডিসেম্বর - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

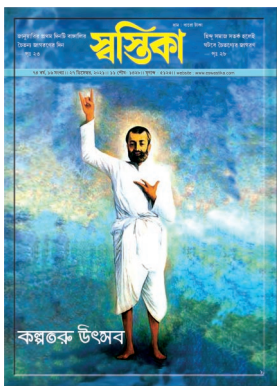

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

তৃণমূলের শুদ্ধিকরণের খেলা অনেকটাই সিপিএমের ধাঁচের
◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

বাংলাদেশে হিন্দুদের বিদায় ঘটছে এবং ঘটতেই থাকবে
◻ শিতাংশু গুহ ◻ ৭

একাত্তরের যুদ্ধ ছিল সাংস্কৃতিকভাবে দ্বিখণ্ডিত পাকিস্তানের সঙ্গে সম্মিলিত ভারতের ◻ স্বপন দাশগুপ্ত ◻ ৮

পুরভোটে তৃণমূলের প্রহসনে বামেদের যোগ্য সঙ্গত
◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

বিপিন রাওয়াতের আকস্মিক মৃত্যুতে দেশদ্রোহীদের উল্লাস কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় ◻ ড. তরুণ মজুমদার ◻ ১১

বিজ্ঞান শিক্ষায় ঔপনিবেশিক দাসত্বের ইতিহাস
◻ পিন্টু সান্যাল ◻ ১৩

একুশ জন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ও জঙ্গির সহযোগী হিমশৈলের চূড়ামাত্র ◻ জহরলাল পাল ◻ ১৫

২০১৩ সালে সোনিয়া-মনমোহন দেশকে বিক্রি করতে যাচ্ছিলেন ◻ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ◻ ১৭

জানুয়ারির প্রথম দিনটি বাঙ্গালির চৈতন্য জাগরণের দিন
◻ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ◻ ২৩

লোকহিতে তিনি হলেন কল্পতরু ◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ২৬

হিন্দু সমাজ সতর্ক হলেই ঘটবে চৈতন্যের জাগরণ
◻ রামানুজ গোস্বামী ◻ ২৮

পাঁচ দশক পর ঢাকার রমনা কলীমন্দিরের সংস্কার
◻ আনন্দ দেবশর্মা ◻ ৩০

কালীদাসের মৃত্যুরহস্য ◻ ড. অশোক দাস ◻ ৩১

হারিয়ে যাওয়া এক স্বাধীনতা সংগ্রামীর খোঁজে
◻ কৌশিক রায় ◻ ৩৩

জেনারেল বিপিন রাওয়াতের দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত দেশের নিরাপত্তা ও অস্তিত্বের প্রশ্ন ◻ ধীরেন দেবনাথ ◻ ৩৫

সিলেবাসে আওরঙ্গজেব দক্ষ প্রশাসক, ধর্মান্ধ নন
◻ শ্রী রাধাকান্ত ঘোড়াই ◻ ৩৭

কিংবদন্তী বলে, আইশমোকামে সংরক্ষিত লাঠি ব্যবহার করেছিলেন ঈশাইনাথ ◻ দেবাশিস চৌধুরী ◻ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ রঙ্গম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৮ ◻ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে ৩ জানুয়ারি ২০২২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৩ জানুয়ারি ২০২২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

মানুষের মেলায়

প্রবাদ আছে, কারোর পৌষমাস, কারোর সর্বনাশ। অর্থাৎ পৌষমাস সমৃদ্ধির মাস। কথাটা মিথ্যে নয়। একবিংশ শতকেও বাঙ্গালির পৌষমাস মানে নানা স্বাদের, নানা রঙের মেলা। এই তালিকায় যেমন বইমেলা এবং শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা আছে, তেমনই আছে গঙ্গাসাগরের মেলা। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যা মেলা নিয়ে। প্রতিটি মেলার স্বভাব, চরিত্র— মেলাপ্রাঙ্গণে উপস্থিত মানুষজনের কথাবার্তার টুকরোটাকরা দিয়ে সাজানো হবে সংখ্যাটা।

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে স্বস্তিকার **২৪ জানুয়ারি ২০২২** তারিখের সংখ্যাটি **'স্বাধীনতা-৭৫'** বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হবে। সংরক্ষণযোগ্য এই সংখ্যাটির **মূল্য ৫০.০০ টাকা**। এই তথ্যবহুল সংখ্যাটি অধিকাধিক মানুষের কাছে পৌঁছে যাক এই আশা নিয়ে আপনাদের কাছে বিশেষ আবেদন, সংখ্যাটির বহুল প্রচারের জন্য সহযোগিতা করুন। আপনার কত কপি প্রয়োজন আগামী ৮ জানুয়ারির মধ্যে অবশ্যই জানান যাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যা ঠিকমতো আপনাকে পাঠাতে পারি।

যোগাযোগ—

শ্রীজয়রাম মণ্ডল, মো: ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

৮৬৯৭৭৩৫২১৪

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বাঙ্গালির চৈতন্য জাগরিত হউক

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষ মুনি-ঋষি, সাধু-সন্ন্যাসীর দেশ। মানব কল্যাণের জন্য তাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন সাধনা করিয়াছেন। সেই সাধনাশক্তিতে তাঁহারা সংসারী ছাপোষা মানুষদের পথপ্রদর্শন করিয়াছেন, চলার পথকে সুগম করিয়াছেন। এই সর্বত্যাগী মহামানবগণ জগতের কল্যাণ কামনায় কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন বলিয়াই ভারতবর্ষে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রতেজ ও রাষ্ট্রশক্তি জাগরিত হইয়াছে। তাঁহাদের তপোবলেই ভারতবর্ষ বিশ্বগুরুর আসন লাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের লোককল্যাণকারী রাজা-মহারাজাদের পথপ্রদর্শক ছিলেন সর্বত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীরা। ইতিহাস ইহা প্রমাণ করিতেছে। ভারতবর্ষে বঙ্গপ্রদেশের বাঙ্গালিরাও সেই তপোশক্তির প্রভাবে বিশ্ববন্দিত হইয়াছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাঙ্গলার গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজের তপোবলে সমগ্র মানব জাতিকে উদ্দীপ্ত করিয়াছেন। জগতের কল্যাণ কামনাই তাঁহার একমাত্র কাম্য ছিল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখনীর দ্বারা সমগ্র বিশ্বে বাঙ্গালি জাতির সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষকে বিদেশি শাসন মুক্ত করিতে সারা বিশ্বকে নাড়া দিয়াছেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শিক্ষার জগতে আমূল সংস্কার করিয়া বিশ্ববাসীর কাছে উন্নত সর্বজনীন বিদ্যাশিক্ষার প্রমাণ রাখিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হইল, সনাতন অধ্যাত্মবোধ বিস্মৃত হওয়ায় বাঙ্গালি দুর্বলে পরিণত হইয়াছে। নীরদ সি চৌধুরী বলিয়াছেন, 'যেইদিন হইতে বাঙ্গালি অধ্যাত্ম বিমুখ হইয়াছে সেইদিন হইতে তাহার অধঃপতন শুরু হইয়াছে।' সেই অধঃপতন হইতে উদ্ধারকল্পে বারবার সেই মহামানবরা আবির্ভূত হইয়া জাতিকে রক্ষা করিয়াছেন। বহিরাগত আক্রমণকারীদের অত্যাচারী শাসনকালে বাঙ্গালি যখন তাহার ধর্ম-কর্ম সমস্তই হারাইতে বসিয়াছিল তখনই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য আবির্ভূত হইয়া বাঙ্গলা ও বাঙ্গালিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শুধুমাত্র বাঙ্গলা বা ভারতবর্ষকে প্লাবিত করেন নাই, আজ সারা বিশ্বের ধর্মপ্রাণ মানুষ 'হরে কৃষ্ণ' নামে মাতোয়ারা। এই সমস্ত কিছুর বিশ্বজনীনতার ফলস্বরূপ ঠাকুরের মুখনিঃসৃত চৈতন্যের বাণী—যাহা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানব জাতির কল্যাণের পথপ্রদর্শক। ইংরেজ রাজত্বে আবার যখন বাঙ্গালি দিশেহারা, ইংরেজকেই তাহার প্রভু মানিতে শুরু করিয়াছে, তাহাদের অত্যাচার ও শোষণে বাঙ্গালার বুকে হাহাকার নামিয়া আসিয়াছে, তখনই আবির্ভূত হইলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। ইংরাজ শাসনে হতপ্রভ বাঙ্গালি বিশেষত কলকাতার বাঙ্গালির অবস্থা দেখিয়া তিনি অস্থির হইয়া উঠিতেন। তিনি গভীর বেদনায় মা সারদাকে বলিয়াছিলেন, 'কলিকাতার মানুষগুলি পোকার মতো কিলবিল করিতেছে, তোমাকে ইহাদিগকে দেখিতে হইবে।' তিনি কলিকাতার বাঙ্গালিদের সেই সময় চৈতন্যহীন অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তাই তিনি তাঁহার গৃহীভক্তদের মাধ্যমে সমগ্র বাঙ্গালিকে বার্তা দিয়াছিলেন, 'তোমাদের চৈতন্য হউক।' দুর্বল নিপীড়িত, দিশাহীন বাঙ্গালি তথা ভারতবাসীকে তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ অভীঃ মন্ত্রে জাগ্রত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালি দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বাঙ্গালি আবার তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। দিশাহীন ও বিজাতীয় রাজনীতির যাঁতাকলে পড়িয়া বাঙ্গালি আজ আবার সর্বত্র নিন্দিত। যে বাঙ্গালি জাতি ভারতবর্ষের পথপ্রদর্শক হইয়া দেশে নবজাগরণের উন্মেষ ঘটাইয়াছিল তাহারা আজ সর্বত্র নিন্দার পাত্র হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের সুদূরপ্রসারী উন্নতির লক্ষ্য নাই, ভিক্ষাবৃত্তিতেই সন্তুষ্ট। শত্রু-মিত্র ভেদ বোধ নাই, রাষ্ট্রবোধ নাই; যেনতেন প্রকারে ক্ষমতা লাভ করাই তাহাদের লক্ষ্যে পরিণত হইয়াছে। এমতাবস্থায় বাঙ্গালির উত্তরণের একমাত্র পথ হইল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শরণ লওয়া এবং আকুল আর্তি জানানো—হে প্রভু আমাদের চৈতন্য জাগরিত হউক। আর তখনই সমস্ত রকমের দুর্বলতা কাটাইয়া বাঙ্গালি স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত হইতে পারিবে

সুভাষিতম্

যৎকর্ম কৃত্বা কুর্বংশ্চ করিষ্যংশ্চৈব লজ্জতি।

তজ্জ্ঞেয়ং বিদুষা সর্বং তামসং গুণলক্ষণম্।।

যে কর্ম করার পরে, করার সময় অথবা করার আগে লজ্জা অনুভব হয়, তা সবই তামসিক কর্ম।

তৃণমূলের শুদ্ধিকরণের খেলা অনেকটাই সিপিএমের ধাঁচের

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

আপাতত ঘুমিয়ে মমতা। জেগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলে শুরু হয়েছে শুদ্ধিকরণ অভিযান। ফ্ল্যাশব্যাক জুন ২০১৮। নেতাজী ইন্ডোর। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীসভা। —'এই যে তৃমমূল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। যা পায় দলকে কিছু দেয় না। তাহলে দল চলবে কী করে। ২৫ শতাংশ নিজেরা খরচ করবেন আর ৭৫ শতাংশ দলকে দেবেন'। হুংকার ছেড়েছিলেন মমতা। কোনো লাভ হয়নি। সবটাই চোখে ধুলো বা আই ওয়াশ হিসেবে থেকে গিয়েছে।

'১১২টার মধ্যে না হয় ১০ বা ১২টা পৌরসভা আমরা হেরে যাব। তার জন্য দুর্নীতিকে আর মদত দেওয়া যাবে না'। কথাগুলি এক নিশ্বাসে বলে ফেলেই জিভ কাটলেন নামজাদা এক তৃণমূল নেতা। বললেন 'এসব লিখ না। নেত্রী রেগে যাবেন।' বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ কিছুদিন আগেই জানিয়েছেন, 'আমাদের হাতে কটাই বা পৌরসভা আছে। খুব বেশি হলে ৩০/৩২টা হবে।' তথ্য আর অবস্থান ঠিক হতে পারে। তবে সময়টা আমার ঠিক বলে মনে হয়নি।

২০১৮-র পঞ্চায়েত ভোটে গ্রামবাঙ্গলার ৩৫ শতাংশ মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেয় তৃণমূল। রাত পোহাতেই হাতে হাতে ফল পায় তারা। ২০১৯-এ লোকসভা ভোটে ১৮ আসন দখল করে বিজেপি। তৃণমূল ১২ আসন হারিয়ে ২২ আসন পায়। আবার সামনে ১১৪ পৌরসভা নির্বাচন।

তৃণমূলের টার্গেট লোকসভা ২০২৪। দলের বিপর্যয় এড়াতে তাই এখন থেকেই হুঁশিয়ার মমতা আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোট নিয়ে কোনওরকম জুয়া খেলার পক্ষপাতী নন তারা। তাই শুরু হয়েছে শুদ্ধিকরণ অভিযান। এটা এক ধরনের খেলা। ৩৪ বছরে সিপিএমকে মাঝে মাঝে এ খেলা খেলতে দেখেছি। অনেক কাল আগের কথা। 'লর্ড মাউন্টব্যাটেন গো তোর ব্যাটন কারে দিয়া গেলি গো'— বেহালায় দলের এক আঞ্চলিক পথসভায় গান গাইছেন প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা সাধন গুপ্ত। অজান্তে তার মাথা বারবার ঘুরে যাচ্ছে মঞ্চে বসে থাকা জ্যোতি বসুর দিকে।

ভাবটা 'কমরেড আপনি আমার গান শুনছেন তো'। এ গান আপনার জন্য। আপনি না শুনলে আমার গান গাওয়া বৃথা। ভোট বাজারে বামেরা আজ অপ্রাসঙ্গিক। জ্যোতি বসু বা সাধন গুপ্তরা কেউ নেই। গানও হারিয়ে গিয়েছে। দু-একজন নেতার কাছে সব কিছুই ডেডিকেটেড বা সমর্পিত। কংগ্রেস, তৃণমূল বা বিজেপিতে। তৃণমূলকে এক নেতা, কংগ্রেস আর বিজেপিতে দুই। দল কেবল নামকাওয়াস্তে। সব দলেই তাই। কোথাও স্টালিন, কোনোখানে শরদ পাওয়ার কোথাও বা আবার নবীন পট্টনায়ক কিংবা অখিলেশ যাদব বা মায়াবতী অথবা অরবিন্দ কেজরিবাল।

সংখ্যালঘু তুষ্টিকরণ আর কাট-মানির দাগ লেগে যাওয়া দলীয় সংস্কৃতি পালটাবে কি তৃণমূল? দুর্জনে বলে শত বার ধুলেও কয়লা পরিষ্কার হয় না। আশায় রইলাম। যদিও জানি এ ক্ষেত্রে সে আশা মিথ্যা কুহকিনী।

১৯৯৬ সালে সিপিএমে তার ছন্দপতন ঘটে। দলের চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠা জ্যোতি বসুর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনা দল বাতিল করে দেয়। ২০০৮-এ দল আবার দ্বিমাত্রিক হয়ে যায়। কোনো কারণ না দেখিয়ে তাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আর লোকসভার স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে বহিষ্কার করা হয়। তৃণমূলে ঢুকে যাওয়া আবর্জনা সরাতে মাঠে নেমেছেন অভিষেক আর মমতা। রাজ্যের জমি আপাতত বিরোধীশূন্য বলে ধরে নিয়েছেন তাঁরা। তাই নিজেদের দলকেই টার্গেট করেছে তৃণমূল।

মমতা ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতার কথায় 'এখন তো এ রাজ্যে পিঁপড়েও তৃণমূল। তাই ঝাড়াই বাছাই প্রয়োজন'। এ ব্যাপারে সিরিয়াস অভিষেক। তিনি বারবার সাইরেন বাজিয়ে জানাচ্ছেন কোনও ভাবেই বরদাস্ত হবে না কোনও দুর্নীতি। এমনকী কলকাতা পুরভোটে যারা জোর করে বিরোধীদের বাধা দিয়েছেন বা আইন ভেঙে ছাপ্পা মেরেছেন তারাও রেহাই পাবেন না। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে অভিষেকের জয় নিয়ে বহু প্রশ্ন এখন নিরুত্তর থেকে গিয়েছে।

দুর্নীতিমুক্ত হওয়ার জন্য তৃণমূলের এই আচমকা চেষ্টা নিয়ে সন্দিহান অনেকে। হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। সরাসরিভাবে প্রমাণ করা না গেলেও এ বিষয় তৃণমূলের ট্র্যাক রেকর্ড যে মোটে ভালো নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাদ নয় বিজেপিও। সেখানেও ঢুকে আছে তৃণমূলের কিছু দাগি নেতা। ফলে রাজ্যের প্রধান দুই দলেই মিশে আছে অনেক দাগি। মানুষ তাই দিশেহারা।

তবে ২০২৪-এর আগে জাতীয় রাজনীতিতে ভাবমূর্তি তৈরির খাতিরে পালটাতে চাইছে তৃণমূল। পারবে কি? সংখ্যালঘু তুষ্টিকরণ আর কাট-মানির দাগ লেগে যাওয়া দলীয় সংস্কৃতি পালটাবে কি তৃণমূল? দুর্জনে বলে শত বার ধুলেও কয়লা পরিষ্কার হয় না। আমি তা মানি না। জনমানসে তাতে কী এসে যায়। আশায় রইলাম। যদিও জানি এ ক্ষেত্রে সে আশা মিথ্যা কুহকিনী। ▯

বাংলাদেশে হিন্দুদের বিদায় ঘটছে এবং ঘটতেই থাকবে

শিতাংশু গুহ

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পর ২০২১-এ দাঁড়িয়ে সুদূর নিউইয়র্ক থেকে স্বদেশভূমির দিকে তাকালে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে অপরিচিত মনে হয়। সত্তরের দশকের শেষপাদে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে আমরা যখন কর্মজীবনে ঢুকি, তখন আমাদের বন্ধু-বান্ধব যে যেদিকে পারছিলেন বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছিলেন। সুযোগ এসেছিল, দেশ ছাড়িনি। মনে হয়েছিল, ঘরের ছেলে ঘরেই থাকি। শেষপর্যন্ত দেশ ছাড়তে হয়েছে। এখন মনে হয়, 'সেই তো মল খসালি; তবে কেন লোক হাসালি?' অর্থাৎ দেশ তো ছাড়তেই হলো, আগে কেন ছাড়লাম না! যে দেশ ছাড়তে চাইনি, যে দেশকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সাজাতে চেয়েছি, আজকের বাংলাদেশ সেই দেশ নয়। সব মানুষের দেশ বাংলাদেশ ছিল কাম্য। ধারণা ছিল, আশা ছিল দেশ হবে সবার। তা আর হলো কই? ধর্মান্ধ শক্তি বাংলাদেশে ধর্মের ঢোল এত জোরে বাজাচ্ছে যে, প্রগতিশীল শক্তির কণ্ঠ প্রতিদিন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। তাই ভাবি, যে দেশ ছেড়ে এসেছি, সে-দেশে কি আর ফিরে যেতে পারবো?

উত্তর সোজা। না, ফেরা সম্ভব নয়, ইচ্ছে থাকলেও নয়! কেউ কি অন্ধকূপে ঝাঁপ দেয়? কথায় আছে, 'নিশ্চিত ছেড়ে যে অনিশ্চিতে ধায় একুল-ওকুল সে দু'কুল হারায়?' ১৯৯২-৯৩-এ দাঙ্গার পর দেশে গেলে আত্মীয়স্বজন বা হিন্দুদের প্রায় সবাইকে 'বলির পাঠা'র মতো কম্পমান মনে হয়েছে। আমার সুহৃদ রুহুল বললো, 'ক'দিন আগে এলে অবস্থাটা বুঝতে— 'সবার মনে দেখেছি দেশ ছাড়ার প্রবণতা।' জীবন ও সম্ভ্রম বাঁচানোর এই আর্তি বড়ো করুণ। আমেরিকায় থাকি বলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে হয়েছে। মনে হয়েছে, এ দেশে ধর্মের নামে কেউ আমার সন্তানের বুকে ছুরি ধরবে না। বাংলাদেশে আমার বাবাও রক্ষা পাননি। শেষ বয়সে তাই তাকে ধুতি ছেড়ে লুঙ্গি পরতে হয়েছে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিতৃপুরুষের ভিটা ছাড়তে হয়েছে। একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করেছিলাম, একটি খাট বাবা কিছুতেই বিক্রি করেননি। যেদিন ওটা তার চোখের সামনে লুট হয়ে যায় সেদিন তার মুখে প্রশান্তির হাসি দেখেছিলাম। এখনো ভাবি, বাবার ওই হাসি'র অর্থ হয়তো লুট হলেও বিক্রি তো করতে হয়নি?

ছোট্ট এই পারিবারিক ঘটনাটি বলার কারণ হচ্ছে, যারা হাসিমুখে বুক চিতিয়ে বলতে পছন্দ করেন যে, হিন্দুরা স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করছে, তাদের বোঝাতে যে, না, ঘটনা তা নয়। হিন্দুরা দেশত্যাগ করছে, আপনাদের অত্যাচারে অথবা অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপনাদের নীরব ভূমিকার কারণে। হিন্দুরা যেতে বাধ্য হচ্ছে, বাধ্য করা হচ্ছে। সেবার দেশে গেলে আমার এক আত্মীয়া বলেন, তোমার জিনিসপত্রগুলো তুমি নিয়ে যাও; নইলে কবে লুট হয়ে যাবে কে-জানে। কথাটা সত্য। সম্পদ, জীবন, কন্যা, লুট হবার আশঙ্কার মধ্যেই হিন্দুরা গ্রামেগঞ্জে বসবাস করেন। হায় স্বদেশভূমি! হায় স্বাধীনতা! তোমাকেই কি আমরা চেয়েছিলাম? না, এ স্বাধীনতা আমরা চাইনি। পাকিস্তান ভেঙে আর একটি 'মিনি পাকিস্তান' সৃষ্টির জন্যে তো স্বাধীনতা আসেনি! বাংলাদেশে হিন্দুরা 'ভূমিপুত্র', শুধুমাত্র ধর্মের কারণে মুক্তিযুদ্ধে তাদের টার্গেট করে হত্যা করা হয়। ধর্ষিতা ও নিহতের বেশিরভাগ হিন্দু। এক কোটি হিন্দু ভারতে আশ্রয় নেয়। এরপর স্বাধীন বাংলাদেশে 'হিন্দুরা আজ নিজদেশে পরবাসী'।

যারা মনে করেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুর মাথা লাঠি মারার জায়গা, তাদের কাছে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! মাঝে মাঝে মনে হয়, রাহুই যদি চন্দ্রকে গ্রাস করবে, তাহলে কী দরকার ছিল এই স্বাধীনতার?

বাংলাদেশে প্রায় সবাই কথায় কথায় ভারতে সাম্প্রদায়িকতার প্রসঙ্গ টানেন। অনেকদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায় একটি সুন্দর যুক্তি তুলে ধরেছিলেন। এক বিদেশি রেডিয়োয় সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'ভারত থেকে সাম্প্রদায়িকতা এখনো দূর করা যায়নি এটা ঠিক। তবে তা সত্ত্বেও দেশভাগের সময় ভারতে যত মুসলমান ছিলেন, বর্তমানে তাদের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। পক্ষান্তরে পাকিস্তানে দেশভাগের সময় প্রায় ৩৩ শতাংশ অমুসলমান ছিলেন, এখন সেই সংখ্যা কমে ১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের চিত্রও প্রায় একই। সেখানে প্রতিদিন সংখ্যালঘু কমছে। এই চিত্র থেকে সাম্প্রদায়িকতা কোথায় বেশি তা স্পষ্ট হতে পারে'। বাংলাদেশের মানুষ ধর্মান্ধ নয়, বরং অসাম্প্রদায়িক। কথাটা মিথ্যা। অবশ্য, সংখ্যালঘুর সম্পত্তি দখল, নারী অপহরণ, জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ, নির্যাতন মন্দির গির্জা-প্যাগোডা ধ্বংস, ব্যবসা-বাণিজ্য লুটপাট যদি সাম্প্রদায়িকতা না হয় তাহলে ভিন্ন কথা!

যারা মনে করেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুর মাথা লাঠি মারার জায়গা, তাদের কাছে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! মাঝে মাঝে মনে হয়, রাহুই যদি চন্দ্রকে গ্রাস করবে, তাহলে কী দরকার ছিল এই স্বাধীনতার? সংখ্যালঘুর বিদায় তো ঘটছেই এবং ঘটতেই থাকবে। □

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

একাত্তরের যুদ্ধ ছিল সাংস্কৃতিকভাবে দ্বিখণ্ডিত পাকিস্তানের সঙ্গে সম্মিলিত ভারতের

পূর্বপাকিস্তানের অধিবাসীদের পশ্চিমের সঙ্গী হয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া কোনো পথ অবশিষ্ট ছিল না।

কিছু কিছু ঘটনার প্রতিচ্ছবি থাকে যা চিরকালীন ভাবে একটি জাতির যৌথ স্মৃতিতে প্রথিত হয়ে যায়। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে ঢাকায় হতমান পাকিস্তানি সেনাধ্যক্ষ নিয়াজী যখন ভারতের কাছে শর্তহীন আত্মসমর্পণের চুক্তিতে সই করছেন ইতিহাসের সেই মহালগ্নটিতে ভারতীয় সেনার লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিত সিংহ অরোরার একদৃষ্টে সেটি অবলোকন করা এমনি একটি। তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানে ভাষাগত ও শাসন কাঠামোগত ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভের মোকাবিলায় মাত্র সাত মাস আগে সেনা নামানো পাকিস্তান সরকারকে যে লজ্জাজনক আত্মসমর্পণের মাধ্যমে ইতি টানতে বাধ্য হতে হয় তা বাংলাদেশ নামক একটি নতুন দেশের জন্ম শুধু নয় ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস ও ভূগোল উভয়কেই নাটকীয়ভাবে বদলে দেয়। ঘটনা ঘটে যাওয়ার মুহূর্তেই ইতিহাস রচিত হয়ে যায় ঠিকই কিন্তু সেই ইতিহাস যখন পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরবর্তী প্রজন্মগুলির মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ার প্রশ্ন ওঠে তখনই ঘটনার খুঁটিনাটি বিশদে উন্মোচিত হওয়ার দরকার পড়ে।

ভারতের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৫০ বছর আগের বিধ্বংসী জয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলি ভুট্টোর সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর ওই বছরেরই মাঝামাঝি সিমলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া অবধি ঘটনা পরম্পরার পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসকে আতসকাঁচের তলায় রাখা যেতে পারে। তবে এই বিশ্লেষণটিই যে অন্তিম বা সর্বাংশে প্রামাণ্য এটা বলা যাবে না। অন্তত যতক্ষণ না পাকিস্তানের লেখ্যাগার তাদের কাছে সংরক্ষিত যুদ্ধপূর্ব, যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধ পরবর্তী চিঠিপত্র সম্পূর্ণরূপে না প্রকাশ করছে। ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা ও স্মৃতি থেকে আহৃত যে সমস্ত লেখালেখি ও স্মরণ ভারত, বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাওয়া যায় শুধু তার ওপর ভিত্তি করলে ইতিহাস অবশ্যই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পরিস্থিতির অনুধাবন ত্রুটিপূর্ণ হবে। পাকিস্তানে ১৯৭১ সালে অস্থিরতা ও কলরোল তৈরির মূলে ছিল দেশের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যার ভিত্তিতে গরিষ্ঠতা ও ভাষার ভিন্নতা। এরই অন্তিম পরিণতিতে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মাধ্যমে পুরো পূর্বপাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়াটা বোঝা যায়। পাকিস্তান নামক দেশটিতে সংযুক্ত ভারতের মুসলমানরা বসবাস করতে পারবে না, কেননা তারা ধর্ম সূত্রেই একটা আলাদা জাতি এই তত্ত্বের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে তৈরি হলো। তবে সেটি পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর ওপর একটি তছনছ হয়ে যাওয়া আবেগের জন্ম দিল। এখনও পাকিস্তানের কিছু কিছু মহল এটা বিশ্বাস করেন যে ভারতই চক্রান্ত করে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যাপক গণ-আন্দোলন সংঘটিত করাকে কি তাঁরা অস্বীকার করতে পারবেন? একই সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার গণআন্দোলন সংগঠনকারী তাদেরই দেশবাসীর একটা অংশের ওপর ইসলামাবাদের সেনাবাহিনী যে ধারাবাহিক অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে ছিলেন তাই-বা অস্বীকার করবেন কীভাবে? পূর্বপাকিস্তানের অধিবাসীদের পশ্চিমের সঙ্গী হয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া কোনো পথ অবশিষ্ট ছিল না।

একটা বিষয় বলা দরকার, ৬০-এর দশকে, বিকৃতভাবে জাতীয়তাবাদী পাকিস্তানি Field Marshal আয়ুব খান তাঁর সেনা বাহিনীকে জঙ্গি করে তোলার জন্য বোঝাতেন, ১ জন পাকিস্তানি সেনার সমকক্ষ কম করে ১০ জন ভারতীয় সেনা। তারা ধোপে টিকবে না। এঁরা পরবর্তীকালে গভীর অপমান হজম করার সমস্যায় পড়েন যখন ভারতীয় সেনা তাদের নাস্তানাবুদ শুধু নয় ৯৩ হাজারের এক অকল্পনীয় সংখ্যায় যুদ্ধবন্দি করে। কিন্তু আমাদের মধ্যে ভারতবর্ষের এই

বিনা শর্তে বিপুল সেনা প্রত্যার্পণের ক্ষেত্রে যে মহানুভবতা প্রদর্শনের তত্ত্ব চালু আছে সেটা সবটা ঠিক নয়। সে সময় কূটনীতিক কৌশল হিসেবে এটা গৃহীত হয়েছিল যে পাকিস্তানের সঙ্গে চিরস্থায়ী শত্রুতা বৃদ্ধি করা ঠিক হবে না। সেটা যাকে বলে counter productive হতে পারে।

তবে এটা ঠিক এই যুদ্ধ দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করেছিল যে দ্বিজাতি তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে দেশভাগ হয়েছিল ও স্বাধীন পাকিস্তান তাঁর জাতিবাদের ঝান্ডা উড়িয়েছিল তা ছিল সম্পূর্ণ ভুল। প্রথমত, মূলত পশ্চিম পাকিস্তানে একটা দৃঢ় বিশ্বাস বলবৎ ছিল যে বাংলাভাষীরা ইসলাম অনুযায়ী সঠিক মুসলমান হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য নয়। তাদের মধ্যে হিন্দু প্রভাব কাজ করে। এরই সূত্রপাত হয়েছিল পাকিস্তানের জন্মলগ্নে। মহম্মদ আলি জিন্নাও মনে প্রাণে এমনটাই বিশ্বাস করতেন। যে কারণে১৯৪৮ সাল থেকেই তিনি উর্দুকে পূর্ব পাকিস্তানে মূল ভাষা হিসেবে চালাবার নির্দেশ দেন। এই বিষয়টাই পূর্ব ও পশ্চিম মিলিয়ে একটি একান্নবর্তী পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদী ধারণাকে বড়ো ধাক্কা দেয়।

এই হিন্দু বিদ্বেষের বড়ো প্রমাণ মেলে ১৯৭১ সালের বিক্ষোভ দমনের সময় পাকিস্তানি সেনা হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর বাড়তি অত্যাচার চালায়। যুদ্ধের শেষের দিকে পূর্বপাকিস্তানে থাকা বুদ্ধিজীবীদের লক্ষ্যবস্তু করে নিকেশ করে দেয়। বারবার যে বলা হয় ৭১-এর যুদ্ধে পূর্বপাকিস্তান থেকে কোটির ওপর শরণার্থী ভারতে এসেছিল তার ধর্মবিন্যাস গবেষণা করে এক তদানীন্তন মার্কিন কুটনীতিক সম্প্রতি 'Blood Telegram' বলে একটি বইয়ে জানিয়েছেন এই পলায়নকারীদের গরিষ্ঠাংশই ছিল হিন্দু। পূর্বপাকিস্তান বিরোধিতার ইতিহাস আরও গভীরে প্রোথিত। ১৯৭০ সালের সম্মিলিত পাকিস্তানের নির্বাচনে আওয়ামি লিগ গরিষ্ঠতা পায় আসন সংখ্যার বিচারে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তারা কোনো ভাবেই আওয়ামি লিগ নেতা মুজিবুরকে ক্ষমতার শীর্ষে বসাতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাদের যুক্তি ছিল এই দলের পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো অস্তিত্ব নেই। পাকিস্তান, পাকিস্তানিদের মতে পাক স্থান অর্থাৎ খাঁটিদের বাসভূমি যেখানে বাংলা বলা মুসলমান সর্বদা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলে গণ্য।

> **পশ্চিম পাকিস্তানে একটা দৃঢ় বিশ্বাস বলবৎ ছিল যে বাংলাভাষীরা ইসলাম অনুযায়ী সঠিক মুসলমান হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য নয়। তাদের মধ্যে হিন্দু প্রভাব কাজ করে। এরই সূত্রপাত হয়েছিল পাকিস্তানের জন্মলগ্নে।**

দ্বিতীয়ত, যুদ্ধ চলাকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তারা নীতিগত ভাবে ভাবতেন পশ্চিম প্রান্তে ভারতকে যুদ্ধে লিপ্ত রাখতে পারলে ভারতীয় সেনা পূর্বপ্রান্তে সংঘর্ষের সুযোগ পাবে না। এই সুযোগে তারা আন্তর্জাতিক ফোরামে বিষয়টিকে তুলে আনতে পারবে। যেখান থেকে যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানানো হবে। একই সঙ্গে পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্ব এটা ভাবছিলেন কিছুদিন যুদ্ধ চালাতে পারলেই বৃহৎ শক্তিধর আমেরিকা ও চীন তাদের পাশে দাঁড়াবে। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউএনও-র বকলমে একটি যুদ্ধ সমাপ্তির প্রস্তাব নিয়ে আসবে। আবার একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর পাকিস্তানি কূটনীতিকরা এমনটাও ভাবতেন যে চীন পূর্বপ্রান্তে তাদের সঙ্গে ভারতের সীমান্তে আগ্রাসনের নীতি নিয়ে ভারতকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে। বাস্তবিক আমেরিকার তরফে ভারতের যুদ্ধ পরিস্থিতির ওপর লাগাম পরাবার একটা প্রত্যাশা পাকিস্তানের ছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালে ভারত-সোভিয়েত চুক্তি সম্পাদন হয়ে যাওয়ার পর সেটি দুরবস্থায় পরিণত হয়।

তৃতীয়ত, পূর্ব পাকিস্তানে তৈরি হওয়া উত্তাল পরিস্থিতির ক্ষেত্রে ভারতের তরফে এমনটা কখনই পূর্বানুমান করা হয়নি যে পাকিস্তানকে দু' টুকরো করা হবে। পূর্বতন কূটনীতিক চন্দ্রশেখর দাশগুপ্তের লেখা থেকে জানা যায় যে ১৯৭১ সালের শেষাশেষিও পররাষ্ট্র দপ্তরের একটা অংশের সরল বিশ্বাস ছিল পাকিস্তান খণ্ডিত হবে না। এখানে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী একটি ফ্রন্ট থেকে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার যে দুর্লভ সুযোগ এসেছিল মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় সহযোগিতা করে তিনি পরিস্থিতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন।

পরিশেষে নতুন বাংলাদেশ তৈরির ক্ষেত্রে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামি লিগের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছিল— এটা মানতেই হবে। পাকিস্তানি উর্দুভাষী সেনাবাহিনীর আগ্রাসনকে নিরন্তর গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে মুক্তিবাহিনী পর্যুদস্ত করেছিল। তাদের হাতে পর্যাপ্ত যুদ্ধাস্ত্র হয়তো ছিল না কিন্তু যে ইস্পাত কঠিন মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে তারা মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য খানসেনার বিরুদ্ধে লড়ে জীবন বিসর্জন দিয়েছিল তা সর্বার্থেই ছিল স্বাধীনতা সংগ্রাম। অন্যদিকে বিভিন্ন পক্ষ থেকে কটুকথা ও বিরোধী মন্তব্যকে অগ্রাহ্য করে আওয়ামি লিগ নেতা তাজউদ্দিন আমেদ ভারতের বাংলাদেশকে সাহায্য করার আন্তরিকতাকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু ভারতের ওপর সন্দেহকারীরা দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও ওঁত পেতে ছিল। ১৯৭৫ সালে অগাস্টে তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুরকে সপরিবারে ও আওয়ামি লিগের প্রবীণ নেতাদের খুন করতে দ্বিধা করেনি। □

পুরভোটে তৃণমূলের প্রহসনে বামেদের যোগ্য সঙ্গত

এই প্রতিবেদন যখন লেখা হচ্ছে, তখন কলকাতা পুরভোটে তৃণমূলের বিপুল জয়ের খবর আসছে। সেইসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের নিদান, বিজেপির হারানো জমি ফিরে পাচ্ছে সিপিএম। বিষয়টি খতিয়ে দেখা যাক। পুরভোটের আগে তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, তৃণমূলের কেউ ভোটে অশান্তিতে অংশ নিলে দল কড়া ব্যবস্থা নেবে। আরও একধাপ এগিয়ে বলেছিলেন, এবার অন্যরকম ভোট দেখবে মহানগরবাসী। তাঁর এই দাবির যথার্থতা নিয়ে সপ্তাহ দুয়েক আগে এই স্তম্ভেই প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল আমাদের আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণ করে, পুরভোটে ছাপ্পা, জালিয়াতি, বিরোধীদের বিশেষকরে বিজেপি প্রার্থীদের হেনস্থা, এজেন্টকে ভীতি-প্রদর্শন করে বুথে বসতে না দেওয়া, নির্দল প্রার্থীর নামে জাল এজেন্ট ঢুকিয়ে বিরোধীদের ওপর নজরদারি চালানো, বিরোধী প্রার্থী ও সমর্থকদের বেদম মার— গত ১৯ ডিসেম্বর সারাদিন এমনই 'শান্তিপূর্ণ' ভোটের নানা চিত্র উঠে এল বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমে। অর্থাৎ ভোটলুঠ ও ভোটে গুন্ডামির যে ট্র্যাডিশন কংগ্রেস আমলে শুরু হয়েছিল, চৌত্রিশ বছরের বামজমানায় যাকে বলা চলে একপ্রকার শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল— তাই তৃণমুল জমানায় এসে চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছে।

তৃণমূলের নেতারা ভোটের দিন সন্ধ্যাবেলায় বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে বসে জোর গলায় চেঁচাচ্ছিলেন, এবার পুরভোটে কোনো জীবনহানি হয়নি বলে। যেন ভোট এলেই নিরীহ মানুষের জীবন যাবে, শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দলে কিংবা বিরোধী দল করার অপরাধে। এটা যেন অত্যন্ত স্বাভাবিক একটা ঘটনা! বাস্তবিক আমরা তাই দেখেছি অবশ্য, এবারের বিধানসভা নির্বাচনের সময় বা আরও মারাত্মকভাবে নির্বাচনোত্তর হিংসার ঘটনায়। কোনো কোনো মহল থেকে এমনও প্রচার করা হচ্ছে, 'তৃণমূল জিতল, অভিষেক হারলো' বলে। কারণ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় 'ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার' ইলেকশানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা তা মানেননি। এই জন্যেই নাকি অভিষেক হারলেও, তৃণমূল জিতল। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, এরাজ্যের সংবাদমাধ্যম মানুষকে যতটা বোকা ভেবে এসব সংবাদ বানায়, অভিষেকের ভাবমূর্তি গঠনের লক্ষ্যে, কেননা 'মোদী-বিরোধী মুখ' হিসেবে মমতা-অভিষেককে তুলে ধরার গরজ এরাজ্যের সংবাদমাধ্যমের থাকতে পারে, রুটি-রোজগারের তাগিদেই সম্ভবত, কিন্তু এরাজ্যবাসীর সে দায় নেই। বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমের পর্দায় অভিষেকের বাইট যখন ভেসে উঠছিল, 'বিজেপি এজেন্ট না পেলে আমরা কী করতে পারি?' কিংবা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক রসিকতা, ভবানীপুরের ভোটকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে, 'কলকাতা পুলিশকে ধন্যবাদ। তারা বহিরাগতদের রুখে দিয়েছে' বলার সময় যে নির্জলা সত্যটা দিনের আলোর মতো প্রকাশ হয়ে পড়ে তা হলো, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোট নির্বিঘ্নে করতে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আসলে ভাঁওতামাত্র। তিনি নিজেও খুব ভালো করেই জানতেন, জনমতে আস্থা রাখলে যে কোনও সময় তাঁর দল ডুববে। আর নীচের তলায় তাঁর কোনো নিয়ন্ত্রণও নেই। কোনো কোনো মহল থেকে এমনও প্রচার চালানো হচ্ছে, তৃণমূলের নাকি বিপুল জনসমর্থন আছে। তা হলে ভোটে এতো হিংসা, এতো সন্ত্রাস কেন? কারণ জনমতে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আস্থা রাখেন না। এমনকী গণতন্ত্রেও তাঁদের আস্থা নেই। যদি থাকতো, তবে নির্বাচনী ক্ষেত্রের আওতার বাইরে থাকা বিধাননগরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে রাষ্ট্রব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে পুলিশ দিয়ে আটকাতো না। এত ভয় কিসের? এর আগেও রাজ্যে ভোটের দিন অগণতান্ত্রিকতা, অমানবিকতার ছবি দেখা গেছে। ২০১৫-র কলকাতা পুরভোটে, ২০১৮-র পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল ঠিক কী ধরনের কতটা সন্ত্রাস চালিয়েছিল, তা রাজ্যের মানুষ জানেন। এবং রাজ্যের মানুষের ক্ষোভের প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল গত লোকসভা ভোটে।

> "রাজ্যের মানুষ যখনই সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদের স্পষ্ট মতামত জানাতে দ্বিধা করেননি। তৃণমূল এই মতামতকেই ভয় পায়।"

অর্থাৎ, রাজ্যের মানুষ যখনই সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদের স্পষ্ট মতামত জানাতে দ্বিধা করেননি। তৃণমূল এই মতামতকেই ভয় পায়। কারণ গত পাঁচ বছরে কলকাতার নাগরিক পরিষেবার মানের অবনতি হয়েছে, উপরন্তু তোলাবাজি ইত্যাদি গুন্ডামি বাড়ায় সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়েছে। কিছু মানুষ যদি তৃণমূলকে ভোট দিয়ে থাকেন, তবে সেটা ভক্তিতে নয়, ভয়ে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম গণতন্ত্রে কি এটাই কাম্য? প্রশ্নটা কিন্তু থাকছেই। তাই যদি তাদের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব মুখে শান্তিপূর্ণ ভোটের কথা বলেন, সেটা প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। বামপন্থীরা মনে করেন এবং কিছু সংবাদমাধ্যমও প্রচার করছে, বামপন্থীরা নাকি হারানো জমি ফিরে পাচ্ছে এবং বিজেপি নাকি ক্রমশ জমি হারাচ্ছে। ভোটের দিন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যের কন্যা সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানান, 'ভোট শান্তিপূর্ণ হচ্ছে'। এবার যা বোঝার বুঝে নিন। আমাদের কিছু বলা হয়তো শোভনীয় নয়।

বিপিন রাওয়াতের আকস্মিক মৃত্যুতে দেশদ্রোহীদের উল্লাস কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়

জীবন পণ করে দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করে চলা সেনাবাহিনীর মনোবল ভাঙার চক্রান্তে শামিল পেট্রোডলারে লালিত জিহাদি ও বামপন্থীদের এই অপরিসীম বিকৃতির শেষ কোথায়?

ডঃ তরুণ মজুমদার

জল, স্থল ও বিমান বাহিনীকে ইন্টিগ্রেটেড থিয়েটার কম্যান্ডের অধীনে এনে ভারতীয় সামরিক শক্তিকে অনন্য সাধারণ উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়ার মহৎ উদ্যোগে ব্রতী নিরলস কর্মযোগী সিডিএস জেনারেল বিপিন রাওয়াত দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। ভারতমায়ের এই আকস্মিক অপূরণীয় ক্ষতিতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে শুরু করে আপামর দেশবাসী শোকে বিহ্বল। অথচ দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই মর্মান্তিক সংবাদ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে চলেছেন বেশ কিছু মানুষ। এদের প্রোফাইল দেখুন। প্রত্যেকেই হয় কমিউনিস্ট নতুবা জিহাদি । দেশের অপূরণীয় ক্ষতিতে এরা উল্লাসে মেতে উঠেছেন, ঠিক যেমন ২০১০ সালে জেএনইউ ক্যাম্পাসে উৎসবে মেতে উঠেছিলেন দান্তেওয়াড়াতে মাওবাদীদের কাপুরুষোচিত আক্রমণে ভারতমায়ের ৭৬ জন বীর জওয়ান বীরগতিপ্রাপ্ত হবার পর।

আসলে, একশো বছর আগে সুদূর তাসখন্দে অশুভ আঁতাতের যে বীজ বপন করা হয়েছিল, আজ তা সমস্ত শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে সমাজে বিষ ছড়াতে ব্যস্ত। সুলতান আহমেদ খান তারিন, মহম্মদ শফি, মহম্মদ আলি প্রভৃতি মুজাহিদ হিসেবে খিলাফত আন্দোলনে যুক্ত হয়ে জেহাদের ডাকে সাড়া দিয়ে 'ইসলামিক আটোমান খিলাফত'-এর স্বপ্নকে সার্থক করতে তুর্কির উদ্দেশে রওনা দেন। পরে ১৯২০ সালে জেহাদি সঙ্গীদের সঙ্গে কাবুল পর্যন্ত পৌঁছান। কাবুলে রুশ কমিউনিস্ট নেটওয়ার্কের সংস্পর্শে এসে মস্কো আসেন এবং অবনি মুখার্জি ও মানবেন্দ্র রায়ের সঙ্গে যুক্ত হন এবং ওই বছরেই সকলে মিলে তাসখন্দে কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। এইসব ইসলামি জিহাদি মনোভাবাপন্ন মানুষদের সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্টদের আত্মিক সম্পর্ক কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই। ভারতের বামপন্থীদের ইন্টেলেকচুয়াল পাইয়োনিয়ার মানবেন্দ্র নাথ রায়ের মতে ভারতবর্ষে জাতির ধারণা কোনও কালেই ছিল না, ব্রিটিশরা আসার পরই নাকি ভারতে জাতির ধারণার উন্মেষ ঘটে। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে, ভারতে বামপন্থার পথ চলা শুরু হয়েছিল সুপ্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে তাচ্ছিল্যভরে দূরে সরিয়ে রেখে জিহাদি শক্তিকে আপন বানানোর মাধ্যমে।

১৯৬২ ভারত-চীন যুদ্ধের দগদগে ক্ষত ও গ্লানি মোচনের জন্য যখন আপামর ভারতবাসী উন্মুখ, সেই যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে এক বাম বুদ্ধিজীবী প্রতুল মুখোপাধ্যায়, লিন পিয়াওয়ের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে রচনা করলেন 'তরীতে নির্ভর কর্ণধার' নামক কবিতা। কবিতাটির শেষাংশ একটু তুলে

ধরলাম —

'চীনের চেয়ারম্যান মাও
আমাদের চেয়ারম্যান মাও
চীনের পথ সে তো আমাদেরও পথ
সেই পথে আগুয়ান ভারতের সর্বহারা।।'

যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে বামপন্থী নেতা নাম্বুদিরিপাদ কী বলছেন শুনুন....''....the Chinese had entered territory that they thought was theirs and hence there was no question of aggression.''

(A Traveller and the Road–The Journey of an Indian Communist, Mohit Sen). শুধু তাই নয়, কেরালার বাম নেতা ও জে জোসেফের নেতৃত্বে ঘোষণা করা হয়, এই যুদ্ধে আহত ভারতীয় সেনাদের রক্তদান পার্টি বিরোধী কার্যকলাপ বলে পরিগণিত হবে। ভি এস অচ্যুতানন্দ রক্তদানের পক্ষে সওয়াল করলে, তাকে পার্টি বিরোধী কার্যকলাপের দায়ে অভিযুক্ত করে পার্টির সেন্ট্রাল কমিটি থেকে অপসারিত করা হয়। আজও সমানে বয়ে চলেছে একই ট্রাডিশন। ২০০২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর আমেরিকার সান্টা ফে-তে 'Come September' শীর্ষক একটি বক্তব্যে বিশিষ্ট বামপন্থী লেখিকা অরুন্ধতী রায় কী বলেছেন একটু শুনুন.....''In India, not hundreds, but millions of us would be ashamed and offended if we were in anyway implicated with the present Indian Government's fascist policies which, apart from the perpetration of state terrorism in the valley of Kashmir....'' অর্থাৎ, স্বৈরাচারী ভারত সরকার কর্তৃক কাশ্মীরে সংঘটিত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের কারণে তার মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ লজ্জিত। কাশ্মীর উপত্যকায় প্রতিনিয়ত মুসলিম জেহাদিদের হাতে ঘটে চলা নারকীয় হত্যালীলা নিয়ে কোনও শব্দ ব্যয় না করে বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে নিজের মাতৃভূমিকে স্বৈরাচারী বা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস পরিচালনাকারী বলাটা কতটা যুক্তিযুক্ত, তা বামপন্থীরাই বলতে পারবেন। Freedom of expression-এর দোহাই দিয়ে যদিও বা অরুন্ধতী রায়ের বক্তব্যকে উপেক্ষা করা যায় কিন্তু বিস্ময়ে হতবাক হতে হয় যখন দেখা যায় এই দেশদ্রোহী বক্তব্যকে বিকৃত মতাদর্শের কিছু মানুষ এদেশে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার মাধ্যমে যুবা মননে কদর্যতার ছাপ ফেলতে উদ্যত হয়। হ্যাঁ, প্রতিটি জাতীয়তাবাদী চিন্তনে সিক্ত সংগ্রামী হৃদয় ভীষণভাবে অবাক হবে যখন জানবে যে এই বক্তব্যটিই বামশাসিত কেরালা রাজ্যের কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের তৃতীয় সেমিস্টারের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের পঠনপাঠানের উদ্দেশ্যে! ২০১৭ সালে সিপিআইএমের কেরালা রাজ্য সম্পাদক কোদিয়ারি বালাকৃষ্ণনের নিজের দেশের সেনা সম্পর্কে বিবমিষা উদ্রেককারী মূল্যায়ন শুনলে হতবাক হতে হয়। বালা কৃষ্ণনের মন্তব্য অনুযায়ী ভারতীয় সেনার কাজ মহিলাদের অপহরণ করে ধর্ষণ করা!

নাগাল্যান্ডের ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক, এতে কোনও সন্দেহই নেই। এই ঘটনা নিয়ে এরা সোচ্চার হয়েছেন এবং হওয়াও উচিত, অথচ এই এরাই নিরবচ্ছিন্ন নীরবতায় ডুবে থাকেন যখন ১৩ই নভেম্বর বিচ্ছিন্নতাবাদীরা কর্নেল বিপ্লব ত্রিপাঠী, তাঁর স্ত্রী এবং তাদের মাত্র আট বছরের শিশুকে পৈশাচিক উল্লাসে হত্যা করে। জীবন পণ করে দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করে চলা সেনাবাহিনীর মনোবল ভাঙার চক্রান্তে শামিল পেট্রোডলারে লালিত জিহাদি ও বামপন্থীদের এই অপরিসীম বিকৃতির শেষ কোথায়? দেশ বিরোধিতার আর বিকৃত রাজনৈতিক আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে আরব ও চৈনিক সাম্রাজ্যবাদের উপর আস্থাশীল বিশ্বাসঘাতক বাম ও জিহাদিদের প্রতিনিধি জেএনইউ ছাত্রনেতা সার্জিল ইমাম শাহিনবাগ অস্থিরতার মধ্যমণি হয়ে অসম-সহ সমগ্র উত্তর পূর্বকে আমার-আপনার মাতৃভূমি থেকে আলাদা করার দাবি তুলছে। দেশের কিছু উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এরাই 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি', 'হামে চাহিয়ে আজাদি', 'জিন্নাওয়ালি আজাদি'র স্লোগান তুলেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, নিজেদের বিকৃত রাজনৈতিক উত্তরাধিকারকে ছাপিয়ে আরও একধাপ এগিয়ে স্লোগান তুলছে 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে, ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ।'

একদিকে 'মার্কসবাদ সর্বশক্তিমান, কারণ ইহা সত্য' আর অপরদিকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মহম্মদুর রসুলুল্লাহ' অর্থাৎ একদিকে কার্ল মার্কসের তত্ত্বকে সর্বশক্তিমান হিসেবে প্রচার আর অপরদিকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনও উপাস্য নেই অথবা একদিকে বিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শের মানুষদের শ্রেণীশত্রু, প্রতিক্রিয়াশীল বলে দাগিয়ে দিয়ে তাদের উপর হিংস্র শ্বাপদের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পরা আর অপরদিকে মৌলবাদী জিহাদি কর্তৃক মানব সভ্যতাকে হয় আপনি মুসলমান, না নয় কাফের বলে দ্বিধা বিভক্ত করা — এই দুই জোড়া ফলায় দেশের কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে নবযৌবনের স্বভাবজাত বৈপ্লবিক মননকে সুকৌশলে জারিত করে তোলার অপচেষ্টা ক্রমাগত চলে আসছে। এখানেই না থেমে নিজেদের সুপ্রাচীন ঋদ্ধ ঐতিহ্যকে তাচ্ছিল্যভরা ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে 'হিন্দু রাষ্ট্র ইজ রেপিস্ট (Hindu state is rapist)' লেখা ব্যানার নিয়ে এরাই কলকাতার রাজপথে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন।

দেশমাতৃকাকে মাতৃরূপে স্বীকার করতে অস্বীকৃত হওয়া আদ্যন্ত জাতীয়তা বিরোধী জিহাদি ও বাম শক্তির এই অশুভ মেলবন্ধনকে কড়া হাতে দমন করা সরকারের আশু কর্তব্য। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্য সরকার সিডিএস জেনারেল বিপিন রাওয়াতের এই মর্মান্তিক আকস্মিক প্রয়াণে উল্লসিত হওয়া বিজাতীয় এলিমেন্টগুলোকে চিহ্নিত করে শাস্তি দিতে উদ্যত হয়েছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই চূড়ান্ত অসংবেদনশীলতার বিরুদ্ধে এখনো কোনও কঠোর ভূমিকা নিয়ে রাজ্য সরকার রাষ্ট্রহিতের প্রতি সদর্থক মনোভাব দেখাতে পারেনি। কেন এই অসহায়তা; কীসের স্বার্থে? বৃহত্তর বাঙ্গালি সমাজ দেশবিরোধী এই চরম নোংরামির বিরুদ্ধে সার্বিক প্রতিবাদে গর্জে ওঠার পরিবর্তে 'বাদাম বাদাম দাদা কাঁচা বাদাম' নিয়ে চিল্লানোকে সংগীতের মর্যাদা দিতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। এই বাঙ্গালিকে কী বলবেন? আত্মঘাতী বাঙ্গালি না-কি রাষ্ট্রহিতের চেতনারহিত রাজনৈতিক-সামাজিক -অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিধিতে দেউলিয়া হওয়া নির্লজ্জ বাঙ্গালি?

বিজ্ঞান শিক্ষায় ঔপনিবেশিক দাসত্বের ইতিহাস

পিন্টু সান্যাল

পঞ্চম পর্ব

ইউক্লিড ঃ সত্য না কল্পনা?

বিজ্ঞানের একটি প্রধান বিষয় গণিত এবং গণিতের ইতিহাসে জ্যামিতি চর্চার ইতিহাস সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জ্যামিতি চর্চার ইতিহাস সেই দেশের সংস্কৃতি ও দর্শন সম্পর্কে গুরত্বপূর্ণ ধারণা দেয়।

ভারতবর্ষে যজ্ঞবেদী নির্মাণ ও সঠিক পরিমাপের প্রয়োজনে জ্যামিতির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে এবং পরবর্তীতে মূর্তি ও মন্দির নির্মাণে ত্রিমাত্রিক জ্যামিতির অনেক জটিল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনে উদ্ভূত গাণিতিক তত্ত্ব পরে সাধারণ মানুষের জীবনেও কাজে লাগতে শুরু করে।

ভারতবর্ষের গণিত চর্চার সে ইতিহাস আজ বিস্মৃতপ্রায়। গণিত পড়তে গিয়ে বিভিন্ন তত্ত্বের আবিষ্কর্তা হিসেবে ইউরোপের বিভিন্ন নাম বিশেষত বিভিন্ন গ্রিক নাম বারেবারে আমাদের সামনে আসে এবং আমাদের অবচেতনে সেই সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা গড়ে ওঠে। অন্যদিকে গণিতের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অবদান এবং সেই গণিতের জন্মদাতা দর্শন ও সংস্কৃত সম্পর্কে অজ্ঞানতা ভারতীয়দের হীনমন্যতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

জ্যামিতি পড়ার সময় ইউক্লিড নামটির সঙ্গে আমাদের পরিচিত হতেই হবে। ইউক্লিডকে 'Father of Geometry' বলা হয়। ইউক্লিডের 'Elements'-কে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি প্রভাবশালী বই বললে ভুল হবে না। 'Elements' ম্যাথামেটিক্স-এর সঙ্গে বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়কেও প্রভাবিত করেছে। সবথেকে বেশিবার ছাপানো বইয়ের তালিকায় বাইবেলের পরে 'Elements'-এর স্থান। 'Elements'-এর লেখক হিসেবে ইতিহাসে ইউক্লিডের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ইউক্লিডের সম্বন্ধে আমরা কতটুকু জানি?

বলা হয়ে থাকে ইউক্লিডের জন্ম বর্তমান মিশরের আলেকজান্দ্রিয়াতে ৩২৫ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে এবং মৃত্যু ২৬৫ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে। (এই সময় মিশরের শাসন ক্ষমতা আলেকজান্ডারের সেনাপতি প্রথম টলেমির (Ptolemy) হাতে (৩২৩ খ্রিঃ - ২৮৩ খ্রিঃ পূঃ)।

কিন্তু 'Elements'-এর এমন কোনো পান্ডুলিপি নেই যেখানে ইউক্লিড (Euclid) নামটি পাওয়া যায়। Sir Thomas Heath, 'A History of Greek Mathematics'-এ বলেছেন ''All our Greek texts of the Elements up to a century ago....purport in their titles to be either 'from the edicetion of Thon' or from the lectures of Theon, ''অর্থাৎ থিয়ন-এর লেখা থেকে Elements সম্পর্কে জানা যায়, 'Elements' নামে কোনো পাণ্ডু লিপি নেই। থিয়ন আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির শেষ গ্রন্থাগারিক এবং থিয়নের সময় অর্থাৎ চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষের মতো মিশরেও মিশরীয় দেবতা সেরাপিস (Serapis)-এর মন্দিরের পাশে এই গ্রন্থাগারটি ছিল। বিশপ থিওফিলাস (Theophilus) -এর নেতৃত্বে উত্তেজিত জনতা সেরাপিসের মন্দিরের সঙ্গে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। অর্থাৎ থিয়নের যে lecture-এর কথা বলা হচ্ছে তা পঞ্চম শতাব্দীর। অর্থাৎ পঞ্চম শতাব্দীর আগে কোথাও 'Elements' এর উল্লেখ নেই।

বিভিন্ন বইতে, ইন্টারনেটে ইউক্লিডের যে ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরা হয় তা একজন শ্বেতাঙ্গ গ্রিকের মতোই দেখতে। কিন্তু মিশরে ইউক্লিডের জন্ম হলে তাকে অতি সহজেই শ্বেতাঙ্গ হিসেবে মেনে নিতে অসুবিধা হয় বই কী! আমরা যদি মিশরের স্ফিংস এর মূর্তি দেখি, তাহলে এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে স্ফিংস এর মাথাটা নিগ্রো অর্থাৎ কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের মতো। এমনকি গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডেটাসের মতে 'Egyptians are black with woolly hair'।

ইউক্লিডকে শ্বেতাঙ্গ মানুষ হিসেবে ধরে নেওয়া কি তাহলে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্রিকদের মহিমান্বিত করার এক গভীর পরিকল্পনা?

ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে এই দ্বিধা-দ্বন্দ থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক জ্যামিতি বইয়ের ইউক্লিডের ছবি শিশুমনে গেঁথে যায় এবং একদিন তা চিরন্তন সত্যের রূপ পেয়ে যায়।

'Euclides' কথাটি ক্রুসেড পরবর্তী সময়ের ল্যাটিন গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় এবং 'Euclides' কথাটি এসেছে আরবী শব্দ 'uclides' থেকে যার অর্থ 'key to geometry'।

আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি টলেডো লাইব্রেরিতে প্রচুর আববিতে লেখা বইয়ের

ল্যাটিনে অনুবাদ হয় এবং এই অনুবাদের সময় 'uclides' পরিবর্তিত হয়ে 'Euclid' হওয়াটা অসম্ভব নয়, কারণ অনুবাদকরা (এদের Mozarabs বলা হয়) আবরি বা ল্যাটিন ভাষা জানলেও বিষয় সম্পর্কে কিছু জানতো না।

ইউক্লিড নামটি Proclus (৪১২– ৪৮৫ খ্রিঃ) এর Element-এর একটি ভাষ্যে (Commentary) পাওয়া যায়। Elements-এর বিভিন্ন ভাষ্যে লেখকের নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না, ব্যতিক্রম শুধু Proclus এর ভাষ্যটি এবং এখানেও একটিমাত্র অনুচ্ছেদে ইউক্লিডের নাম পাওয়া যায়, কারণ এটি Neoplatonic দর্শনের বিপক্ষে বলে। কিন্তু ভাষ্যের বাকি অংশ Neoplatonic দর্শনের পক্ষে বলে। আসলে এই Neoplatonic দর্শনের বিরুদ্ধে অবস্থান ক্রুসেড পরবর্তী খ্রিস্টীয় উপাসনা পদ্ধতিতে বিরুদ্ধাচার বলে গণ্য হতো। অর্থাৎ সমগ্র ভাষ্যটি যে দর্শনের পক্ষে বলছে; ইউক্লিডের নাম থাকা একমাত্র অনুচ্ছেদটি সেই দর্শনের বিপক্ষে বলছে—তাহলে, ভাষ্যটির এই একটিমাত্র অনুচ্ছেদকে প্রক্ষিপ্ত বলা যাবে না কেনো?

Proclus-এর এই ভাষ্যটিতে বলা হয় যে এর আগের ৮০০ বছরে কোনো ঐতিহাসিক কোথাও ইউক্লিডের নাম উল্লেখ করেননি। এছাড়াও Proclus (৪১২–৪৮৫ খ্রিঃ)-এর পাণ্ডুলিপিটি কাগজে লেখা অর্থাৎ পাণ্ডুলিপির সময়কাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরে যখন ইউরোপে কাগজ সহজলভ্য হতে শুরু করে। এর থেকে স্পষ্ট, প্রোক্লুস-এর থেকে ৮০০ বছর পরে এটি লেখা হয়। অর্থাৎ একটি ভাষ্য তার ৮০০ বছর আগের এক ব্যক্তির উল্লেখ করছে যার কথা এই মধ্যবর্তী সময়ে কেউ উল্লেখ করেনি এবং ভাষ্যের পাণ্ডুলিপিটি ভাষ্যকারের সময় থেকে ৮০০ বছর পরের। আর এই পাণ্ডুলিপিকে ইউক্লিড-এর ঐতিহাসিকতার স্বপক্ষে এক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ হিসেবে মেনে নিতে হবে—ইউরোপের ক্ষেত্রে 'বৈজ্ঞানিক প্রমাণ', এর মান এতো শিথিল কেন, এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক নয় কি?

অনেক সময় ইউক্লিডের স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে বলা হয় আর্কিমিডিসের 'Sphere & Cylinder' বইতে ইউক্লিডের উল্লেখ আছে কিন্তু আর্কিমিডিসের সেই পাণ্ডুলিপিটিও তার সময়ের থেকে ১৮০০ বছর পরের।

এখানে অনেকের মনে হতে পারে যে ইউক্লেডের ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে এতো মাথা ঘামানোর প্রয়োজন কী? আসল তো 'Elements' আর তার ভেতরের জ্যামিতির জ্ঞান। ইউক্লিড ছাড়া অন্য কেউ Elements-এর লেখক হলে তো আর জ্যামিতি পালটে যাচ্ছে না। Euclid-এর যদি ঐতিহাসিক সত্যতা না থাকে, তাহলে 'Elements'কে গ্রিসের অবদান বলা যাবে না এবং Elements-এর উৎস আলেকজান্ডার-পূর্ববর্তী মিশরে খোঁজা যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ। শুধু ইউক্লিড নয়, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন আবিষ্কারের সঙ্গে এরকম অনেক গল্প পরিকল্পনামাফিক সৃষ্টি করা হয়েছে শুধু জাতি হিসেবে গ্রিকদের উৎকৃষ্ট প্রমাণ করতে এবং বিজ্ঞানকে গ্রিকদের সৃষ্ট প্রমাণ করতে।

এই গল্পগুলোর পেছনে খ্রিস্টীয় ইউরোপের কী স্বার্থ ছিল তা আগেই বলা হয়েছে। আক্ষেপের বিষয় এই যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের সামনে তুলে ধরা হয় তার বৈজ্ঞানিক সত্যতা নিয়ে আমরা প্রশ্ন করি না। আমরা একবারও প্রশ্ন করি না শুল্বসূত্রের রচয়িতা বৌদ্ধায়ন থাকতে 'Father of geometry' ইউক্লিডের মতো এক কাল্পনিক চরিত্রকে কেনো বলা হবে?

চিন্তার এই দৈন্যতা ঘুচিয়ে আমাদের নিজেদের বিজ্ঞান, নিজস্ব পদ্ধতিকে জানতে হবে এবং তার যুগানুকূল প্রয়োগ করতে হবে। এখন সময় এসেছে শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীন হবার ,কিন্তু তার আগে প্রয়োজন শিক্ষাক্ষেত্রে নিজেদের পরাধীনতাকে উপলব্ধি করা।

গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডেটাসের মতে, গ্রিকরা মিশরীয়দের দেবতা, উপাসনা-পদ্ধতি নকল করেছিল। আজ বিশ্ব বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত গ্রিক দার্শনিকের সঙ্গে পরিচিত যেমন পিথাগোরাস, প্লেটো এমনকী হেরোডেটাসেরও শিক্ষার উদ্দেশ্যে মিশরে যাত্রার কথা শোনা যায়। যখন বিশ্বইতিহাসে গ্রিক সভ্যতার উদয় হয়নি তার আগে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা সমৃদ্ধ হাজার বছর পার করে গেছে। তাই মিশর থেকে গ্রিসে জ্ঞানের প্রবাহ স্বাভাবিক বলেই মনে হয়।

Elements-এর মোট ১৩টি খণ্ড। প্রথম থেকে ষষ্ঠ খণ্ড সমতালিক জ্যামিতি; সপ্তম থেকে নবম খণ্ডে সংখ্যাতত্ত্ব, গুণোত্তর প্রগতি; দশম খণ্ডে অমূলদ সংখ্যা; একাদশ থেকে ত্রয়োদশ খণ্ডে ত্রিমাত্রিক জ্যামিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অঙ্কের বিভিন্ন বিষয় একজন ব্যক্তির পক্ষে এত দক্ষতার সঙ্গে আলোচনা করা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। আমরা জানি, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন তত্ত্বের আবিষ্কার হয়, পরে তার ত্রুটিগুলো অন্য একটি তত্ত্ব দ্বারা সংশোধিত হয়। যেমন নিউটনের গতিসূত্রগুলো খুব বেশি ভর ও উচ্চগতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এই সমস্যা দূর করতে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ এল।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আমরা দেখি আর্যভট্ট পঞ্চম শতাব্দীতে 'আর্যভটীয়া'-তে গণিতের বিভিন্ন বিষয় ও গণনা উপস্থাপন করেন। পরবর্তীকালে ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত 'আর্যভটীয়া'র বেশ কিছু অংশের সংশোধন করেন। ইতিমধ্যে ভারতীয় গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সপ্তম শতাব্দীতে ভাস্কর এবং ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে নীলকণ্ঠের ভাষ্যের মাধ্যমে এগিয়ে যায়। গণিত ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কারের এক নিজস্ব ইতিহাস থাকে। কিন্তু 'Elements'-এ আলোচিত বিভিন্ন তত্ত্বের কোনো পূর্ব ইতিহাস জানা যায় না। ইউক্লিড নামের কোনো ম্যাথামেটিশিয়ান যদি পূর্বের জ্ঞানকে পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে থাকেন, তারও এক স্বতন্ত্র ইতিহাস থাকা বাঞ্ছনীয় নয় কী? গ্রিকদের বিজ্ঞানে অবদানের প্রমাণ হিসেবে যে সমস্ত পাণ্ডুলিপিকে দেখানো হয় তার বেশিরভাগই দ্বাদশ শতাব্দীর পরের। ইউরোপ 'Elements'-এর যে ল্যাটিন অনুবাদ পায় তা আরবি থেকে করা। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের কথামতো এই বইটিকে দশম শতাব্দীর বলে মেনে নিলেও তা ইউক্লিডের কল্পিত সময়ের (৩২৫ খ্রিঃ পূঃ) থেকে ১০০০ বছরেরও পরের। এই হাজার বছরে ইউরোপ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম দেখেছে, উপাসনার নামে উন্মাদনা দেখেছে; পার্সিয়া থেকে প্রচুর অনুদিত বই আলেকজান্দ্রিয়াতে আনা হয়েছে পরে ব্যাত-আল-হাকিম এবং আরো পরে টলেডো লাইব্রেরিতে প্রচুর বইয়ের ভাষান্তর হয়েছে, আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি ধ্বংস হয়েছে কিন্তু অপরিবর্তিত থেকেছে ইউক্লিডের 'Elements'—ইউরোপের এই দাবি কতটা যুক্তিসঙ্গত তার বিশ্লেষণ হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। কারণ বিজ্ঞানের ইতিহাসকেও, বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ছাড়া মান্যতা দেওয়া বিজ্ঞানের প্রতি সবচেয়ে বড়ো অন্যায় এবং বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সম্পর্ক দুর্বল হলে 'ইতিহাস'কে অন্য নামে ডাকতে হয়—'কল্পকাহিনি'। আর প্রত্যেক 'কল্পকাহিনি', তার কাহিনিকারের স্বার্থ অনুযায়ী দিক পরিবর্তন করে। ◻

একুশ জন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ও জঙ্গির সহযোগী হিমশৈলের চূড়ামাত্র

মনীন্দ্র নাথ সাহা

কয়েকদিন আগে দক্ষিণ কলকাতার আনন্দপুর থেকে ২১ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে আটক করেছে পুলিশ। মোবাইল টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে তাদের সন্ধান পায় পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। তবে কী কারণে তারা কলকাতায় এসেছে, তা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। জানা যাচ্ছে ২১ জনের কাছ থেকে যে নথি পাওয়া গিয়েছে, তার অধিকাংশই ভুয়ো।

লক্ষ্ণৌ এটিএস একটি মামলার প্রেক্ষিতে কলকাতায় এসেছে। তারা তদন্ত প্রক্রিয়ার জন্য কলকাতা পুলিশের সাহায্য চায়। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাদের নিয়ে তারা গুলশন কলোনিতে অভিযান চালিয়ে সেখান থেকেই আটক করে এই ২১ বাংলাদেশিকে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তিন জনকে সেদিন রাতেই ছেড়ে দেয়। সোমবার সকালে মানব পাচারকারী চক্রের মুল পাণ্ডা মফিজুর রহমান-সহ ১৮ জনকে আদালতে তোলা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপ্রদেশের অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াডের অধিকারিকরাও। মফিজুরকে তিন দিনের ট্রানজিট রিমান্ডে দেওয়া হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ এটিএস তাদের নিয়ে যায়। অবশিষ্ট ১৪ জন বাংলাদেশিকে আদালত আগামী ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

উত্তরপ্রদেশ এটিএসের ইন্সপেক্টর জেনারেল সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন, কলকাতা থেকে ধৃত মফিজুর রহমানের সঙ্গে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জঙ্গিদের যোগসাজশ রয়েছে। আরও জানা গেছে বিভিন্ন রাজ্যের সরকারি কর্মী ও কয়েকটি বিমান সংস্থার কর্মীও তাঁদের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন। খবর অনুসারে মূলপাণ্ডা মফিজুরের কাছ থেকে প্রায় এক হাজার ভুয়ো পাসপোর্ট পাওয়া গিয়েছে।

কয়েকদিন আগে উত্তর ২৪ পরগনা, নদীয়া ও কলকাতা বিমান বন্দর এলাকা থেকে ৩ জন অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করেছিল উত্তরপ্রদেশ এটিএস। তাদের জেরা করে তারা মফিজুরের নাম জানতে পারেন। জানা গিয়েছে মফিজুর ওই ১৭ জনকে ভুয়ো ভারতীয় পরিচয়পত্র বানিয়ে তাদের কলকাতায় নিয়ে এসেছিল। আরও জানা গেছে উত্তরপ্রদেশ ছাড়াও অন্য আরও কয়েকটি রাজ্যে মোস্ট ওয়ান্টেড ছিল মফিজুর রহমান। সে রোহিঙ্গাদের জাল পাসপোর্ট তৈরি করে তাদের বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দিত।

মফিজুর রহমানের মতো বহু পাচারকারী সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই রয়েছে বহুদিন থেকে। এটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সবকিছুই পরিকল্পিত এবং সেই

মফিজুর রহমান

ধৃতদের আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

পরিকল্পনা শাসক দলের অনুমোদিত। মনে পড়ে আমাদের এরাজ্য এবং কেরল থেকে ৯ জন আলকায়দা জঙ্গি ধরা পড়ার কথা? তাতে গোয়েন্দাদের হাতে বিস্ফোরক তথ্য উঠে এসেছিল। সেই তথ্য হলো ভারত-সহ গোটা উপমহাদেশে ইসলামি শাসনতন্ত্র অর্থাৎ খিলাফত কায়েম করতে চায় আলকায়দা। আলকায়দা ছাড়াও এরাজ্যে হুজি, জে এম বি, সিমি-সহ বহু আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন নিরাপদে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্য সরকারের প্রশ্রয়ে ভোটের বিনিময়ে। দেশের মাদ্রাসাগুলোকে তো অনেকেই জঙ্গি উৎপাদনের কারখানা বলেই মনে করেন। এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আজ জঙ্গি ও অনুপ্রবেশকারীদের তৎপরতা ভীষণভাবে বেড়ে গেছে রাজ্যেরই কিছু রাজনৈতিক ও জেহাদিদের প্রকাশ্য ও পরোক্ষ সমর্থনে।

প্রশ্রয়ের শুরু সেই জ্যোতিবাবুর আমল থেকে। ১৯৮৬-৮৭ সালে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে জ্যোতিবাবুকে যখন এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন—'শোনা যাচ্ছে এরাজ্যে বহু অবৈধ বাংলাদেশি ঢুকে রয়েছে। আপনি কী মনে করেন?' তার উত্তরে জ্যোতিবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে টেবিলের নীচে এদিক ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে বলেছিলেন—'কই, এখানে তো কোনো বাংলাদেশি নেই!' সেই শুরু।

জ্যোতিবাবু অনুপ্রবেশকারী ও সন্ত্রাসীদের এরাজ্যে আসার জন্য যেভাবে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন সেই ধারাকে আরও ব্যাপকভাবে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার কাজ পূর্ণোদ্যমে করে চলেছেন বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিনিধিরা। কী পাওয়া যাচ্ছে না এখানে বলুন তো? চোর-ডাকাত, লুণ্ঠক, ঘাতক, ধর্ষক, মানবপাচারকারী, বোমা-আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কারিগর, এমনকী সন্ত্রাসবাদীও। ওরা যে যেভাবে তাঁদের কর্মে পটু তা সফলভাবে প্রয়োগ করার জন্য পরম যত্নে ওদের এরাজ্যে রাখা হচ্ছে। নচেৎ উত্তরপ্রদেশ এটিএস এদের খোঁজ জানতে পারে অথচ রাজ্য পুলিশ তা জানতে পারে না তা কখনো হয় নাকি? সবই তেনার ইচ্ছায় চলছে।

একবার পিছন ফিরে দেখুন সেই জুনিয়ার ডাক্তারদের কর্মবিরতির কথা। সে সময় এক ৮০-৮২ বছরের মৃতপ্রায় রোগীকে এনআরএস হাসপাতালে ভর্তি করার পর মারা গেলে ট্যাংরা থেকে দুটো লরিভর্তি কারা এসে হাসপাতাল এবং জুনিয়ার ডাক্তারদের ওপর আক্রমণ করেছিল? তাদের কিন্তু কোনও শাস্তি হয়নি। তারপরে নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে যেভাবে এই রাজ্যে রেলস্টেশন, রেলগাড়ি, বাস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, ট্রেনের যাত্রীদের মাথা ফাটিয়ে রক্ত ঝরানো হয়েছিল যার মধ্যে শিশুও বাদ যায়নি, কারা করেছিল এসব মহান কর্ম? ২১-এর ভোট পরবর্তী হিংসায় শাসক বিরোধী বলে হিন্দুদের ওপর যেভাবে আক্রমণ হানা হলো তা কতকটা আফগানিস্তানের তালিবানের সঙ্গে মিলে যায়। না, এরজন্য কারও কোনও শাস্তি হয়নি বা হবেও না। কারণ এখানে হিন্দুদের ওপর আক্রমণকারীরা শাসকের প্রিয়পাত্র। শাসক নিজেই যখন বলে—'মাদ্রাসার ছেলেদের লাগিয়ে দাও, ওরা খুব সাহসী', তখন আন্তর্জাতিক জঙ্গিগোষ্ঠী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বক্তার অনুচরদের হাতে আরবের তৈলাক্ত ডলার পৌঁছাতে যেমন দেরি করে না তেমনি ভারত ও হিন্দু ধ্বংসের বিস্তৃত পরিকল্পনা তখনই সেরে ফেলে। তার প্রমাণ মেলে অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতো মন্ত্রীর মন্তব্যে। তিনি বলেছেন— 'ছোটখাটো ঘটনা, শোনার সময় নেই।'

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি কিন্তু কেন্দ্র সরকার এড়িয়ে যেতে পারে না। আইন-শৃঙ্খলা রাজ্যের দায়িত্ব এই অজুহাতে জনগণকে বিপদমুক্ত না করলে রাজ্যবাসী কিন্তু বদলা নেবে।

প্রথম জীবনে ছন্নছাড়া, চাকরিছাড়া, মানছাড়া, ভিটেছাড়া, শেষে দেশছাড়া হয়ে এদেশে এসে বহু ঘাটের জল খেয়ে থিতু হয়ে মনে হয়েছিল, যাক, এবার নিশ্চিন্ত। আর কোনও ভাবনা নেই। কিন্তু জীবনের শেষ লগ্নে এসে এখন মনে হচ্ছে আবার হয়তো পূর্ব অভিজ্ঞতা ভোগ করতে হবে এই রাজ্যের কিছু লোভী, অর্থগৃধ্নু, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, হিন্দুদ্রোহী, দেশদ্রোহী রাজনীতিকদের সৌজন্যে। তাই অতি চালাক ধাক্কা খাওয়া বা ধাক্কা না খাওয়া এক সন্তানে বিশ্বাসী এবং সেই সন্তানকে মানুষ করার নামে 'ক্লীব'-এ পরিণত করা সবজান্তা হিন্দুদের উদ্দেশে আমার একটাই বিনীত আবেদন— আপনারা এখনও গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন না থেকে নিদ্রাভঙ্গ করুন, উঠুন, চারিদিকে তাকিয়ে দেখুন ধীরে ধীরে আপনার পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। নিদ্রাভঙ্গে দেরি হলে আপনাদের চিরনিদ্রায় পৌঁছতে সময় লাগবে না। আপনার সামনেই আপনার স্ত্রী, কন্যা, ভগিনীদের ধর্ষণ করার পর হত্যা করা হবে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের পা ধরে দেওয়ালে আছাড় মেরে মাথা গুঁড়িয়ে দেবে।

যেসমস্ত সেকুলারপন্থী বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞাপনলোভী সাংবাদিক আছেন যাঁদের পূর্বপুরুষ হয় ঘাড়ধাক্কা খেয়ে বা ইজ্জত হারিয়ে এই পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁদের অধস্তন পুরুষেরা যাঁরা এই সেদিন বিএসএফ-এর এক্তিয়ার বাড়ানো নিয়ে কেঁদে আকুল হয়েছিলেন তাঁরাও কিন্তু কেউ ছাড় পাবেন না। তাদের কাউকে তরবারির ডগায় করে সোজা সেকুলার দেশে পাঠাবে।

তাই বলছি, আমার কথা বিশ্বাস না হলে দয়া করে ১৯৪৬-এর ১৬–১৮ আগস্টের কলকাতার দৃশ্যগুলো কোনও বই-এর পাতা থেকে অথবা নেট থেকে নামিয়ে দেখে নেবেন। তাতেও যদি জ্ঞানচক্ষু না খোলে অচিরেই বুঝতে পারবেন এক সন্তান বিশিষ্ট মাইক্রো ফ্যামিলির সুখ। ◻

২০১৩ সালে সোনিয়া-মনমোহন দেশকে বিক্রি করতে যাচ্ছিলেন

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

জটিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে মোদী বিরোধী দুষ্টচক্র সারাক্ষণ নানা অপপ্রচার চালাতে থাকে। আর একথা অনুমান করতে কারও অসুবিধা হয় না যে সাধারণ মানুষ এই জটিল বিষয় স্বাভাবিক কারণেই বোঝেন না। শুধু তাই নয় অপপ্রচারের ফলে তাঁরা ভুল বোঝেন ও ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। দেশের শাসনতন্ত্রে এর সুদূরপ্রসারী কুফল বর্তায়। বিশেষজ্ঞ মানুষরা ধরে ফেলেন কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে এই ভুল সংশোধনের কোনো নিয়মিত সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক চেষ্টা করা হয় না। তাই এখানে সাধারণ মানুষের জন্য সহজভাবে নীচের দুটি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

১। মোদী বিরোধী চক্রান্তের একটি উদাহরণ। ২। মনমোহন জমানার শেষ কয়েক মাসের আর্থিক কেলেঙ্কারির ছবি।

ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকার মালিক ইয়ং ইন্ডিয়ান প্রাইভেট লিমিটেড। রাহুল গান্ধী ও সোনিয়া গান্ধী তার মেজর স্টেক হোল্ডার, অর্থাৎ কার্যত মালিক। সেই পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছিল যে ২০১৪ সালের মে মাসে ক্ষমতায় আসার পরেই মোদী সরকার গোপনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ২ লক্ষ কিলোগ্রাম মজুত সোনা বিদেশে মানে সুইজারল্যান্ডে পাচার করেছিল। নিবন্ধে দাবি করা হয়েছিল যে সাংবাদিক থেকে রাজনীতিক নবনীত চতুর্বেদী গত বছরে 'তথ্য জানার অধিকার আইনে'র বলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে তৎকালীন মজুত/রিজার্ভ সোনার পরিমাণ জেনে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বার্ষিক রিপোর্ট পরীক্ষা করে এই প্রশ্নগুলো তুলেছিলেন--- (১) সোনার বিনিময়ে

সরকার কী পেয়েছিল? (২) এই আদানপ্রদানের বিষয়টিকে জনসমক্ষে আনা হয়নি কেন?

মনমোহন তাঁর জমানার শেষ পর্বে দেশের অর্থনীতিকে এমন দুর্দশাগ্রস্ত ও ভিখারি বানিয়েছিলেন যে দেশের সোনার ৯০% সোনা বন্ধক রেখে ১.৩৮ লক্ষ কোটি টাকা তুলেও অবস্থার উন্নতি করা যায়নি। এই জন্যই ইউপিএ সরকারকে FCNR(B)-র মাধ্যমে ২.২৩ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ করতে হয়েছিল।

চতুর্বেদী আরও অভিযোগ করেছিলেন যে সরকার স্পষ্টত কিছু গোপন করতে চাইছে এই আশায় যে তারা জনগণের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে সক্ষম হবে।

এই অভিযোগ ছিল ডাহা মিথ্যে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ৩ মে ২০১৯-এ পত্রপাঠ এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেছে, এই ঘটনা অসত্য। একটা প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে আরবিআই বলেছে কোনও সোনা ২০১৪ বা তার পরে সরানো হয়নি। এই বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়েছে যে সারা পৃথিবীর এটাই রীতি যে সব দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মজুত বা রিজার্ভ সোনা বিদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে রাখা হয়।

এবার এর একটা উল্টো ছবি তুলে ধরব। ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে ৫ লক্ষ কিলোগ্রাম সোনা বন্ধক রাখার প্রস্তাব করা হয়েছিল। মোট ৫.৫৭ লক্ষ কিলোগ্রাম সোনা ছিল তখন ভারতের। রাহুল গান্ধী ও তার পেটোয়া কংগ্রেসের ল্যুটিয়েন্স সাংবাদিককুল এমন একটা অস্বস্তিকর খবর চেপে গিয়েছিল কেন? এটা তো দেশের ভয়াবহ অর্থনৈতিক

দুর্দশার ছবি তুলে ধরে?

আজকাল রাহুল গান্ধী ও ল্যুটিয়েন্স মিডিয়ার কংগ্রেসের চাটুকাররা অনবরত বিলাপ করছে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের অর্থনীতির ভরাডুবি ঘটিয়েছেন। তাই আজ অর্থনীতির ভরাডুবি কাকে বলে তা মনে করিয়ে দেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে।

তারিখটা ছিল ২০১৩-র ২৯ আগস্ট। ততদিনে কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ তার মেয়াদের ৯ বছর ৩ মাস অতিক্রম করেছে। ওই তারিখেই সারা দেশের সংবাদমাধ্যমে খবরটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ও দেশ জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের ভাবমূর্তি ভয়ংকরভাবে কালিমালিপ্ত হয়েছিল।

খুব পরিষ্কারভাবে সংবাদে বলা হয়েছিল যে, দেশের অর্থিক অবস্থা এতটাই ভঙ্গুর হয়ে পড়েছিল যে কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী আনন্দ শর্মা প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে দেশের ৫ লক্ষ কিলোগ্রাম সোনা দেশের কোষাগার থেকে বাইরে আনতে হবে। সেই সময়ে তার মূল্য ছিল ১.৩৮ কোটি টাকা।

নিপুণ অর্থনীতিবিদ প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের দশম বছরে দেশের অর্থনীতিকে এমন করুণ অবস্থায় এনে ফেলেছিলেন। সংবাদমাধ্যমে এমন চাঞ্চল্যকর খবর বেরিয়ে পড়ার ফলে দেশে হই হট্টগোলের পরে বাণিজ্য মন্ত্রী আনন্দ শর্মা সাফাই গেয়েছিলেন, 'আমার কথার ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে'। কিন্তু পরবর্তী দুই-তিন মাসের মধ্যে তাঁর এই স্পষ্টীকরণ নস্যাৎ হয়েছিল। সোনা বন্ধক রাখা হয়নি, কারণ দেশ-বিদেশে ঢিঢি পড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু দেশের অর্থনীতির দুর্দশা চাপা দেওয়ার জন্য মনমোহনের ইউপিএ সরকার পিছনের দরজা দিয়ে আর একটা উপায় বার করে ফেলেছিল। ইউপিএ সরকার তার শেষ বছরে সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৩-র মধ্যে ২.২৩ লক্ষ কোটি টাকা বাজার থেকে তুলতে চেয়েছিল। তার মধ্যে ছিল ২৬ বিলিয়ন ইউএস ডলার মূল্যের অর্থ, তা এফসিএনআর (বি)র মাধ্যমে করা হবে বলে ঠিক হয়েছিল।

এফসিএনআর(বি) কী? ব্যাঙ্কগুলো অনাবাসী ভারতীয়দের থেকে বিদেশি মুদ্রায় ইউএস ডলারে স্থায়ী আমানত বা ফিক্সড ডিপোজিট সংগ্রহ করে এবং ওই মেয়াদ পাঁচ বছর অবধি হতে পারে। মেয়াদ শেষে সুদ সমেত আমানত বিদেশি মুদ্রায় ফেরত দেওয়া হয়। এই ঋণের বোঝা মোদী সরকারকে বইতে হয়েছিল সুদ সমেত।

উপরের থেকে এটাও পরিষ্কার যে, মনমোহন তাঁর জমানার শেষ পর্বে দেশের অর্থনীতিকে এমন দুর্দশাগ্রস্ত ও ভিখারি বানিয়েছিলেন যে দেশের সোনার ৯০% সোনা বন্ধক রেখে ১.৩৮ লক্ষ কোটি টাকা তুলেও অবস্থার উন্নতি করা যায়নি। এই জন্যই ইউপিএ সরকারকে FCNR(B)-র মাধ্যমে ২.২৩ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ করতে হয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মোদী সরকার দেশের মজুত সোনাকে ৫৫৭ টন থেকে বাড়িয়ে ৭০৫ টন করেছেন। (২০ জুন, ২০২১ এর রিপোর্ট অনুসারে)।

কেন এত বিপুল পরিমাণ এফসিএনআর (বি) ঋণ করা হলো?

আরবিআইয়ের গভর্নর রঘুরাম রাজন বলেছেন যে, তিনি ২০১৩ সালে বিদেশি মুদ্রা তোলার জন্য 'সবচেয়ে কম খারাপ' পছন্দের এফসিএনআর (বি) কে বেছে নিয়েছিলেন। এই সিদ্ধান্ত রুপি (মানে ভারতীয় মুদ্রা)-কে চাঙ্গা ও মুদ্রারবাজারকে স্থায়ী করতে সক্ষম হয়েছিল। সেই সময়ে ২০১৩ সালে রুপির দাম সর্বকালীন কম হয়েছিল এবং ইউএসএর 'ট্যাপার ট্যান্ট্রামে'র সুযোগ নেওয়া হয়েছিল। তিন বছর ব্যাপী করা হয়েছিল এই আমানতের বা ডিপোজিটের মেয়াদ। মানে মোদী সরকারকে তা শোধ করতে হবে ২০১৬ সালের আগস্ট মাসে।

২০১৩ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাজন দায়িত্বভার নিয়েছিলেন। তখন তিনি দেখেছিলেন যে 'এর চেয়ে ভাল' আর কিছু নেই। যদিও এটাও খারাপ, ঝুঁকিপূর্ণ। আরবিআই-এর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সম্প্রতি ২০২১ সালে এক বক্তৃতায় তিনি একথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমাদের ২০ বিলিয়ন ইউএস ডলার বিদেশি মুদ্রা তুলতে হয়েছিল, দেশের এত খারাপ অবস্থা হয়েছিল যে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের বুঝিয়ে বলতে হয়েছিল যে ভারতে বিনিয়োগ করা এখনো লাভদায়ক যদিও অর্থনৈতিক সংস্কারের কাজ মুখ থুবড়ে পড়েছিল। তাদের এও বোঝাতে হয়েছিল যে খুব তাড়াতাড়ি রুপির দাম বাড়বে। বিনিয়োগকারীদের বোঝাতে হয়েছিল যে দেশ কোনো সঙ্কটের দিকে যাচ্ছে না আর তা দেখানোর জন্য সবচেয়ে সহজ উপায় ছিল তাদের বলা যে আমরা বাজার থেকে প্রচুর পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা তুলতে পারি। যদিও এখন মনে হচ্ছে এটাই সবচেয়ে উত্তমপন্থা ছিল কিন্তু সত্যি বলতে কী আমরা কখনোই জানতে পারব না বাস্তবটা কি ছিল। যেমন পুরনো দিনের হলিডের সুন্দর ছবি দেখে আমরা ভুলে যাই তখনকার গরম, মশা আর বিদ্যুতের অভাবের কথা।

রাজনের উক্তি থেকে স্পষ্ট, অর্থনৈতিক দিকে থেকে এক দিশাহীন সময়ের মধ্যে দিয়ে ভারত চলেছিল অর্থনীতিবিদ প্রধানমন্ত্রীর শাসন কালে। □

With Best Compliments
from -

A

Well Wisher

সিডিএস বিপিন রাওয়াত দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন নাকি শত্রুর চক্রব্যূহে আত্মবলিদান দিলেন

সিডিএস বিপিন রাওয়াতই প্রথম, যিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন বারেবারে যে পাকিস্তান নয়, ভারতের প্রধান শত্রু চীন। আর তাঁর দেখানো কূটনীতির পথে চলতে চলতেই '৬২র ড্রাগন দেশের প্রায় হাঁটু ভেঙে দিয়েছে ভারত। কমিউনিস্ট চিনের সাম্প্রতিক পত্রিকা বা গ্লোবাল টাইমস ঘাঁটলেই লক্ষ্য করা যাবে এই মুহূর্তে ভারতের থেকে চীনের অধিক চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিলেন রাওয়াত। গ্লোবাল টাইমস তো রীতিমতো রাওয়াতের নাম উল্লেখ করে আক্রমণ করে যাচ্ছিল। কারণ, এই বিপিন রাওয়াতের কূটনীতি একদিকে যেমন ভারত-চীন সীমান্তে চীনের আগ্রাসন প্রতিরোধ করে যাচ্ছিল, অন্যদিকে তাঁরই বিচক্ষণতায় রাশিয়াকে নিরপেক্ষ রাখতে সহায়ক হয়েছে ভারত। বিগত ইউপিএ সরকারের সময় থেকেই ভারতের অতিরিক্ত মার্কিন সখ্যতার কারণে দূরে সরে গিয়েছিল রশিয়া। আর রাশিয়ার এই দূরত্বের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তান ও ভারতে বসবাসকারী চীনা এজেন্টদের মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে নানারকম ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল চীন। চিনের সোজা হিসেব ভারতের সঙ্গে সামনাসামনি লড়াই হলে আমেরিকা ভারতের পাশে দাঁড়ালেই চীনকে সাহায্য করবে মার্কিন শত্রু রাশিয়া। কিন্তু বিপিন রাওয়াতের মোক্ষম কূটনৈতিক চাল রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি করিয়ে নেয়। যার ফলে আজ চীন-ভারত সামনে এলে রাশিয়া কোনোভাবেই ভারতের বিরুদ্ধে যেতে পারবে না। অর্থাৎ নিরপেক্ষ থাকবেন পুতিন। আর এভাবেই চীনের ভারতকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার নীতি বুমেরাং হয়ে ঘিরে ফেলেছে চীনকেই। এই সমস্তকিছু মিলিয়ে এই মুহূর্তে কমিউনিস্ট চীনের প্রথম শত্রু ভারত নয়, হয়ে উঠেছিলেন বিপিন রাওয়াত। শুধুমাত্র ৩টি বিন্দু এখানে উল্লেখ করলাম।

বিপিন রাওয়াতের মৃত্যুতে এই মুহূর্তে গোটা বিশ্বে সবচেয়ে অধিক লাভবান হবে একমাত্র কমিউনিস্ট চীন।

স্মরণীয়, গত বছর ঠিক একইভাবে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল চীনের অন্যতম শত্রুদেশ তাইওয়ানের চিফ অফ জেনারেলের, যিনি চীনের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিলেন বিপিন রাওয়াতেরই মতো।

কমিউনিস্ট চীনের রণনীতি— ১৯৪৯ সালে প্রজাতান্ত্রিক চিন গড়ে ওঠার পর থেকে সীমান্ত দেশগুলির সঙ্গে প্রায়শই ছায়াযুদ্ধে জড়িয়েছে চীন। পিঠে ছুরিকাঘাতের নীতিই আজ গোটা বিশ্বে প্রায় একঘরে হয়ে থাকা চীনের প্রাথমিক কূটনীতি।

বিপিন রাওয়াতের আত্মবলিদান নিছক দুর্ঘটনা হোক কিংবা কোনো ষড়যন্ত্র, তবে উপরোক্ত বিন্দু ৩টির গ্রহণযোগ্যতা এই মুহূর্তে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

ঋদ্ধিমান রায়, ব্রহ্মপুর।

মহাভারতের যুগ বেদের কাল

মহন্ত যোগী সুন্দরনাথ মহারাজ 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ' শীর্ষক নিবন্ধে বলেছেন, '... ঐতিহাসিক ভাবে আজ থেকে প্রায় ৩৬০০ বছর আগে মনে করা হয় মহাভারতের যুগ। সুদীপ নারায়ণ ঘোষ 'সিন্ধু সভ্যতা কি বহিরাগত আর্য আক্রমণে ধ্বংস হয়েছিল?' শীর্ষক নিবন্ধে বলেছেন— 'কৃষ্ণের মৃত্যুর অল্প আগে মানে ১৪০০ খ্রিঃপূঃ নাগাদ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল। এবং বলেছেন, ঋগ্বেদের কাল ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বের অনেক আগে। উপরোক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই পত্রের অবতারণা।

এক, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল, দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধিকালে খ্রিস্টপূর্ব ৩১৩৭ অব্দে। অর্থাৎ মহাভারতের যুগ ছিল, আজ থেকে কিঞ্চিতাধিক ৩০০০ বছর আগে।

দুই, কৃষ্ণের মৃত্যু হয়েছিল ৩১০২ খ্রিস্টপূর্ব অব্দে। অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বেশ কিছুকাল পর।

তিন, বর্তমান কলিযুগ শুরু হয় ৩১০১ খ্রিস্টপূর্ব অব্দে। তথ্যসূত্র Indian chronology (8231.BC to 1963 AC), by Dr. D. S. Trivedee, M.A., Ph.D)। উল্লেখ্য সাপ্তাহিক স্বস্তিকাতে (কলি) যুগাব্দের উল্লেখ থাকে। ১৬.৮.২১ তারিখের স্বস্তিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, বর্তমান কলিযুগের বয়স ৫১২৩ বছর। যোগী সুন্দরনাথ মহারাজ এবং সুদীপ নারায়ণ ঘোষের বক্তব্য অনুসারে বর্তমান কলিযুগের বয়স যথাক্রমে ৩৬০০ এবং ৩৪২১ বছর।

সুদীপবাবু বলেছেন, ঋগ্বেদের কাল ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বের অনেক আগে। ড. যোগীরাজ বসু 'বেদের পরিচয়' গ্রন্থে বেদের কাল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তা থেকে জানা যায়, বাল গঙ্গাধর তিলক (১৮৫৭-১৯২০) এবং জার্মান অধ্যাপক য়্যাকাবি (১৮০৪-৫১) সংহিতা ও ব্রাহ্মণের জ্যোতিষ্ক সংক্রান্ত তথ্যের পর্যালোচনা করে উভয়েই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। বৈদিক যুগের সূচনা ৪৫০০ খ্রিস্টপূর্বেরও আগে। জাপানের কাকাসু ওকাকুবার সিদ্ধান্ত— বৈদিক যুগের সূচনা ও সমাপ্তি কাল যথাক্রমে ৪৫০০ খ্রিস্টপূর্ব এবং ৭০০ খ্রিস্টপূর্ব অব্দ। ড. বসু 'বেদের কাল' পরিচ্ছেদের উপসংহারে বলেছেন, এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, বেদের সংহিতা ভাগের সূচনা হয় হাজার খ্রিস্টপূর্বে, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের সূচনা তিন হাজার খ্রিস্টপূর্ব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বামী বিবেকানন্দ 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' (ঋগ্বেদ, ১।১৬৪য৪৬), উল্লেখ করে বলেছেন, এই স্তুতি কোন সময় রচিত হইয়াছিল তাহা কেহই জানেন না। আট হাজার বছর পর্বেও হইতে পারে এবং আধুনিক সকল প্রতিবাদ

ফঃ ৩

সত্ত্বেও ইহার প্রণয়নকার ৯০০০ বৎসর প্রাচীণও হইতে পারে। (বৈদিক ধর্মাদর্শ, বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড)। বিবেকানন্ত বলেছেন, 'পণ্ডিত বাল গঙ্গাধর তিলক প্রমাণ করেছেন যে, হিন্দুদের বেদ অন্তত খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছর আগে বর্তমান আকারে ছিল।' (পরিব্রাজক, বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড)। তিনি আরও বলেছেন, 'বেদ রাশি বিপুল। এই বেদের শতকরা ৯৯ ভাগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিশেষ বিশেষ পরিবারে এক একটি বেদাংশের চর্চা হইত। সেই পরিবারের লোপের সঙ্গে সঙ্গে সেই বেদাংশও লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এখনও যাহা পাওয়া যায়, তাহাও এক প্রকাণ্ড গ্রন্থালয়ে ধরে না।' (খেতড়িতে বক্তৃতা — বেতান্ত, বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড)।

বিমলেন্দু ঘোষ, কলকাতা-৬০

মন্ত্রী বলে কথা

শর্ষীনার পীর স্বীকৃত রাজাকার, তাঁর মুরীদ মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী শ. ম. রেজাউল করিম হিন্দুদের দেশপ্রেমের ছবক দিয়েছেন। বাংলা ট্রিবিউন ১০ ডিসেম্বর ২০২১-এ মর্মে একটি সংবাদ ছেপেছে। রিপোর্টের হেডিং, 'নিজেদের বাংলাদেশের নাগরিক ভাবতে হবে, সংখ্যালঘুদের প্রতি প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী।'

এতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে মন্ত্রী বলেছেন, 'নিজেদের বাংলাদেশের নাগরিক ভাবতে হবে।' তিনি আরও বলেছেন, 'দেশের নাগরিক হিসাবে আপনাদের দৃঢ়চেতা মানসিকতা রাখতে হবে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জন্য কাজ করতে হবে, ভয়শূন্য চেতনার জন্য কাজ করতে হবে। মন্ত্রীর ওয়েবসাইটে ঢুকে আমি মন্ত্রীর এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছি, তাঁকে বলেছি, 'আপনার কাছে হিন্দুদের দেশপ্রেম শিখতে হবে না।'

আজকাল আমাদের দেশের মন্ত্রীরা কত কথাই না বলেন। এ নিয়ে কে মাথা ঘামায়! একজন প্রতিমন্ত্রী সদ্য এক নায়িকাকে কুকথা বলে সরকারের দয়ায় দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। কোথাও ঠাঁই না পেয়ে আবার দেশে ফিরেছেন। কিন্তু রাজাকার যখন মুক্তিযোদ্ধাকে দেশপ্রেম শেখায়, তখন তা এড়িয়ে যাওয়া যায় না। মন্ত্রী পরিবারের কতজন রাজাকার ছিলেন বা এখনও আছেন তা তিনি নিজেই ভালো জানেন। তবে মন্ত্রী হয়ে তাঁরা ভুলে যান যে, মুক্তিযুদ্ধকালে পুরো হিন্দু সমাজের মধ্যে একজনও রাজাকার ছিলেন না। যে দেশের তিনি মন্ত্রী সেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে হিন্দুদের টার্গেট করে হত্যা করা হয়েছিল। সিনেটর রবার্ট কেনেডির রিপোর্ট বলছে, ক্ষতিগ্রস্তদের আশি শতাংশ হিন্দু। এক কোটি হিন্দু দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। মন্ত্রী এসব তথ্য জানেন বা মানেন কিনা কে জানে!

বেশিদিনের কথা নয়, মৎস্য ও পশু মন্ত্রণালয়ের নাম পাল্টে মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয় হয়েছে। অল্পের জন্য আমরা মন্ত্রীকে আদর করে পশুমন্ত্রী বলতে পারলাম না। রাজাকারের সঙ্গে যার শান্তি পূর্ণ সহবস্থান, সেই মন্ত্রীর কাছে হিন্দুদের দেশপ্রেম শিখতে হবে? জন্মগত ও ধর্মীয়ভাবে হিন্দুরা দেশপ্রেমিক। জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপী গরিয়সী— এটি মন্ত্রীর জন্য প্রযোজ্য না হলেও হিন্দুরা তা মানে। হিন্দুরা ভূমিপুত্র, আরব দেশ থেকে মুসাফির হয়ে এদেশে আসেনি। যতকাল এ অঞ্চলে মনুষ্য বসবাস ততকাল হিন্দুরা এই মাটির সন্তান। হিন্দু একটি সভ্য জাতি, বাঙ্গালি সংস্কৃতির ধারক-বাহক। শুধু বাংলাদেশ নয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও হিন্দু বাঙ্গালির অবদান অবিস্মরণীয়।

দেশে কিছু নেতা ও মন্ত্রী নিজেকে 'আমি কি হনুরে' ভাবেন। প্রায়শ হাস্যকর কতাবার্তা বলেন— 'ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল' ভাব ধরেন এবং হঠাৎ করে ধপাস শব্দে ভূতলে পতিত হন। তাঁরা ভুলে যান, .মতায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে কিছু নেই। মন্ত্রী রেজাউল করিম বিনে পয়সার হিন্দুদের অনেক উপদেশ দিয়েছেন। অথচ তাঁর এলাকায় এক হিন্দু সচিবের সম্পত্তি দখল ও বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগে তার সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ হোয়াইট হাউস পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই মন্ত্রীর সঙ্গে জামাতের সখ্যতার অভিযোগ আছে, সদ্য যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ পুলিশের ৭ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, এর পিছনে জামাতের অর্থ এবং লবিং কাজ করেছে বলে। বাইডেনের ডেমোক্রেসি সম্মেলনে বাংলাদেশ আমন্ত্রিত না হওয়ার পেছনেও জামাত। মন্ত্রীর উচিত হিন্দুদের উপদেশ না দিয়ে আত্মীয় জামাতকে উপদেশ দেওয়া।

শিতাংশু গুহ, নিউইয়র্ক

With Best Compliments from :

A
Well Wisher

আইভিলতা রায়চৌধুরী

এই শীতের সময় সবরকম শাকসবজি পাওয়া যায়। যত দামই হোক বাঙালি তা খাবেই, সত্যি কি না বলুন তো? মাছ-মাংস তো আছেই, আজকাল বেশিরভাগ বাড়ির বউ অফিসে যান। নানারকম রান্না করার সময় হয় না। মাংস বেশি করে এনে ফ্রিজে রাখে। আলু দিয়ে ঝোল করে নিল হয়ে গেল। শীতে আমাদের শরীর গরম হয় বেশি তাই হাল্কা রান্নাই বেশি উপাদেয়।

শুক্তো—

আলু, ছোট কচু, কাঁচকলা, বেগুন, করলা, মিষ্টি আলু, বড়ি। ইচ্ছে করলে মূলো, সজনে ডাঁটা দিতে পারেন। সমস্ত সবজি সমান মাপে কাটুন, করলা, বড়ি ভেজে রাখুন। সব ধুয়ে নিন।

এবার কড়ায় তেল দিন, তেল গরম হলে পাঁচফোড়ন দিন। সব সবজি কড়ায় দিন। নুন, হলুদ দিয়ে নেড়ে ঢাকা দিন। আগুন কম থাকবে। দু-একবার নেড়ে জল দিন।

শুক্তোর মশলা— সর্ষে, রাঁধুনি, আদা, মৌরি বাটা।

এবার দেখুন সেদ্ধ হয়ে এসেছে কিনা। জল তো আগেই দিয়েছেন। এবার করলা, বড়ি দিয়ে মিষ্টি দিন। দু-চার মিনিট পর চেখে দেখুন নুন মিষ্টি ঠিক আছে কিনা। খুব বেশি ঝোল থাকবে না, কিন্তু পাঁচ, ছ-জনের জন্য ঝোল তো লাগবে। এবার বাটা মশলা দিয়ে নামিয়ে নিন। কয়েক চামচ ঘি দিন। শুক্তো এমন একটি রান্না যে সবার ভালো লাগে।

নিমপাতার শুক্তো—

বেগুন পাতলা করে কাটুন। কচি সজনে ডাঁটা টুকরো করে নিন। এবার সর্ষে ফোড়ন দিয়ে সবজি কড়ায় দিন। হলুদ নুন দিয়ে সামান্য নেড়ে জল দিন। কচি নিমপাতা ভেজে রেখেছেন তো? সেদ্ধ হয়ে গেলে ভাজা নিমপাতা দিন। হয়ে গেল নিমপাতার শুক্তো। এভাবে পলতা পাতা, শিউলি পাতা, হেলেঞ্চা দিয়েও শুক্তো হয়। বাটা মশলা দিতে হয় না।

বেগুনের রসা—

এটা বিহারে খুব চলে। আমার স্বামী ওদিকেরই বাঙালি।

রসুন খান তো? রসুনের অনেক উপকারিতা আছে। বেগুন লম্বালম্বি ফালা করে কাটুন। হলুদ নুন মাখিয়ে রাখুন। বড় ৬ কোয়া রসুন বেটে রাখুন, টমেটো থাকলে চিরে রাখুন, কড়ায় তেল দিন। তেল গরম হলে মেথি দিন, এবার বেগুনগুলো দিয়ে দিন। বেগুনগুলো একটু ভাজা হলে টমেটো আর রসুনবাটা একটু লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে নেড়ে একটু জল দিয়ে ঢাকা দিন। বেগুন নরম হলে গ্রেভি সমেত নামান। নুনটা চেখে নিন। গরম ভাত বা রুটি দিয়ে ভালো লাগবে।

পুঁই শাকের চচ্চড়ি—

বেশ কিছুটা চিংড়িমাছ পরিষ্কার করে ধুয়ে রাখতে হবে। মাথাগুলো আলাদা করে রাখা। ২-৩ টুকরো কুমড়ো। বাগানে একটা পুঁইশাক বড় হয়েছে, খানিকটা নিয়ে এলাম। অল্প আলু কুমড়ো ধুয়ে রাখলাম। চিংড়ির মাথাগুলো ভেজে রেখেছি। তরকারিগুলো কড়ায় পাঁচফোড়ন দিয়ে চড়িয়ে দেওয়া হলো। হলুদ নুন লঙ্কাগুঁড়ো মিষ্টি দিয়ে তার সঙ্গে শাকও দিয়ে দিলাম। মাছের মাথাগুলো দিলাম। হয়ে গেলে নামিয়ে রাখলাম। সবারই ভালো লাগল। কোনো জিনিস ফেলা যায় না।

কাঁচকলার খোসার বড়া—

দুটো কাঁচকলার খোসা সমেত সেদ্ধ করা। ওর সঙ্গে একটা আলুও সেদ্ধ করলাম। এবার ওগুলোত নুন দিয়ে বেশ করে স্ম্যাশ করলাম। তাতে রসুন কুচো, পিঁয়াজ মিহি করে কুচনো, কাঁচা লঙ্কা কুচো, বেসন আর সামান্য খাবার সোডা দিলাম। এক-দু ফোঁটা জলের ছিঁটে। এবার গোল গোল করে একটু চেপ্টে তেলে ভেজে গরম গরম পরিবেষন। খুব ভাল লাগবে।

আলুর খোসার বাটিচচ্চড়ি—

আলুর খোসা ধুয়ে নিন। কড়ায় কালোজিরা বা পাঁচফোড়ন দিয়ে আলুর খোসা, নুন, একটু হলুদ আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে খুব কম আগুনে জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিন। একটু পরে সিদ্ধ হলে নামান। রুটি ভাত দিয়ে বেশ লাগে। □

অ্যানিমিয়া ঠিক কি এবং কেন হয় ?

ডা: পার্থসারথি মল্লিক

অনেক সময়ই কোনো ব্যক্তির শরীরে যে পরিমাণ হিমোগ্লোবিন থাকার কথা, তা পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে না। শরীরে হিমোগ্লোবিনের এই ঘাটতি বা নেমে যাওয়াকেই অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা বলে। তবে বয়স এবং লিঙ্গের উপর হিমোগ্লোবিনের স্বাভাবিক পরিমাণ নির্ভর করে। এই হিমোগ্লোবিনের ঘাটতির অন্যতম দুটি কারণ হল—

শরীরে স্বাভাবিক পরিমাণ রক্ত তৈরি না হওয়া। রক্ত তৈরি হয় শরীরের অস্থিমজ্জায়। এখানে হেম ও গ্লোবিনের সংমিশ্রণে তৈরি হয় হিমোগ্লোবিন। অস্থিমজ্জায় রক্তকণিকা তৈরির উপাদানগুলি স্বাভাবিকভাবে রক্তকণিকা তৈরিতে ব্যাঘাত ঘটলে হিমোগ্লোবিনের ঘাটতি হয়। এছাড়া পরিমাণ মতো রক্ত তৈরি না হওয়ার কারণ হল ভিটামিন বি-১২, আয়রণের ঘাটতি প্রভৃতি। শরীরে রক্ত কমে যাওয়ার আরও অনেক কারণ রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিডনি ও বোন ম্যারো ফেলিওর সংক্রান্ত সমস্যা। অপুষ্টি, রক্তে ক্যান্সার, অর্শ, অতিরিক্ত ঋতুশ্রাব, শরীরে কোথাও আঘাত লাগলে অধিক রক্তক্ষরণ, মলমূত্রের সঙ্গে রক্তক্ষরণ হলে সহজে বোঝা না যাওয়া। আর দ্বিতীয় কারণটি হল রক্তে লোহিত কণিকা দ্রুত ভেঙে যাওয়া একটি অন্যতম কারণ হতে পারে। ঝঞ্ঝা নামক উৎসেচক ঘাটতি ও অ্যানিমিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়াও আরও অনেক কারণেই শরীরে অ্যানিমিয়ার সমস্যা দেখা দিতে পারে। হিমোগ্লোবিনের স্বাভাবিক পরিমাণ— একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ক্ষেত্রে প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে ১৩.৪ গ্রাম থেকে ১৫.৫ গ্রাম। মহিলাদের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ হল ১২ থেকে ১৪ গ্রাম। আয়রণের ঘাটতিতেও অ্যানিমিয়া হয়। আমাদের দেশে অ্যানিমিয়া হওয়ার একটি অন্যতম কারণ হল আয়রণের ঘাটতি। এই আয়রণের ঘাটতি অনেক কারণেই হয়ে থাকে। শিশুদের সাধারণত পুষ্টিকর খাবারের অভাবেই এই সমস্যা বেশি দেখা যায়। তবে সবসময় আর্থিক সংকটের জন্যই এই

পুষ্টিকর খাবার খাওয়া সম্ভব হয় না তা কিন্তু নয়। অনেক সময় কোন খাবার খেলে আয়রণের ঘাটতি পূরণ হবে, তা না জানার জন্যও এই সমস্যা দেখা দেয়। সকল মহিলার ক্ষেত্রে একাধিকবার গর্ভবতী হওয়ার কারণেও তাঁদের অ্যানিমিয়ার শিকার হতে হয়। কারণ গর্ভাবস্থায় মায়ের গর্ভে থাকা শিশুর বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ আয়রণের প্রয়োজন পড়ে। তাই ওই সময় মায়েদের বাড়তি আয়রণের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এছাড়া কৃমি জাতীয় সংক্রমণে শরীরে আয়রণ কমে যেতে পারে। অ্যানিমিয়ার উপসর্গ সাধারণভাবে নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। তবে শরীর দুর্বল লাগা, মাথাব্যথা, যখন তখন অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট, প্যালফিটেশন, শরীর ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া, বেশি ঘুম, খিদে কমে যাওয়া, এমনকি হার্টবিট বেড়ে যাওয়াও অ্যানিমিয়ার কারণ হতে পারে।

এইসব সমস্যা দেখা দিলেই যে অ্যানিমিয়া হয়েছে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু একটা সম্ভাবনা থেকেই যায়। তাই উপসর্গগুলি দেখা দিলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া ভালো।

শিশুদের অ্যানিমিয়া হলে তা বোঝার সহজ উপায় হল ঠিকমতো খেতে না পারা, চনমনে ভাব উধাও, নিস্তেজ হয়ে থাকা। অ্যানিমিয়া হলে শুধু চিকিৎসকের পরামর্শ নিলেই হবে না। একে প্রতিরোধ করার জন্য নিজেকেও অনেকটা সতর্ক থাকতে হবে। এই রোগের একটি বড় ওষুধ হল আদর্শ ডায়েট। যেটি মেনে চললে এই সমস্যাকে অনেকটাই প্রতিরোধ করা যায়। যেমন এই সমস্যায় কাঁচকলা, মোচা, থোড়, ছোট মাছ, ডুমুর, সবুজ সবজি, কুলেখাড়া পাতা, বাদাম, খেজুর, দেশি কলা নিয়মিত খেলে উপকার পাবেন। কারণ থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের শরীর আয়রণের পরিমাণ স্বাভাবিকের থেকে বেশি হয়ে গেলে আবার হিতে বিপরীত হতে পারে। হোমিওপ্যাথিতে অ্যানিমিয়ার খুব ভালো চিকিৎসার উপায় রয়েছে। হোমিওপ্যাথি সমস্যার মূলে গিয়ে চিকিৎসা শুরু করার আগে রোগের কারণ সম্পর্কে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখে চিকিৎসা করা হয়। সে কারণে এর ফলও হাতে নাতে পাওয়া যায়। ▯

জানুয়ারির প্রথম দিনটি বাঙ্গালির চৈতন্য জাগরণের দিন

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

ভোগের জগৎ আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে, চৈতন্যের জগৎ ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। চৈতন্যবিজ্ঞানের স্বরূপসন্ধান নেই। এই যে অচৈতন্য অবস্থা, এই যে অচেনা ভারতবর্ষ, তার সূচনা ভারত- বিরোধী বৈদেশিক আগ্রাসনের সঙ্গে সঙ্গে। ভারতীয় সমাজের কোণে কোণে, প্রত্যন্ত অঞ্চলকে তা ক্রমে আবিষ্ট করতে চাইল। ভারতবর্ষ হয়ে উঠল মৃতবৎ, তার প্রাণস্পন্দন নেই। একজন রোগী যখন সংজ্ঞাহীন মৃতবৎ হয়ে পড়ে, কোমায় চলে যায়, মেডিক্যাল সায়েন্সে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে তার চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। একইভাবে স্পিরিচুয়াল হাসপাতাল তৈরি করলেন শ্রীচৈতন্যদেব। ভারতবাসীর মধ্যে সত্যিকারের চৈতন্য-বিকাশ ঘটালেন। প্রায় পাঁচশো বছরের মতো সময়ের অসুস্থতা নিরাময়ের চেষ্টা করলেন তিনি। ১৪৮৬ সালে নবদ্বীপে আবির্ভূত হলেন সেই ডাক্তার; ১৫১০ সালে তাঁর ডাক্তারি পাশ করা সম্পন্ন হলো, কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা নিলেন এ যুগের ব্রজেন্দ্র নন্দন, নাম হলো 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য'। দেশবাসীর চৈতন্য এনে দেবেন। এনে দিলেন তাঁর পরিব্রাজন পর্বে (১৫১০-১৫১৫) এবং নীলাচল পর্বে (১৫১৫-১৫৩৩)। তাঁর শুভঙ্করী প্রভাব অব্যাহত রইলো।

তারপর প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের ব্যবধান। আজ থেকে ১৩৫ বছর আগে চৈতন্য বিজ্ঞানের আসরে অবতীর্ণ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি কাশীপুর উদ্যানবাটিতে তিনি কল্পতরু হলেন, বললেন, 'চৈতন্য হোক', জীবনের পরম-প্রাপ্তি ঘটুক। মনে পড়বে শাক্তসংগীত— 'আমার চেতনা চৈতন্য করে দে মা চৈতন্যময়ী।' সন্তান গভীরতমভাবে যেমনটি চায়, জগন্মাতা তেমনটাই করে রাখেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তেমনই এক চৈতন্যের আধার। বাঙ্গালির কাছে তিনি ঈশ্বর। কিন্তু তাঁর চৈতন্য-দানের বাক্স বাঙ্গালি এখনও পুরোটা খুলে

দেখেনি। The gift unopened.

আমরা জানি পরমহংসদেব কামারপুকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং দেহ রেখেছিলেন কলকাতার কাশীপুর উদ্যানবাটিতে। কিন্তু যিনি ঈশ্বর, তাঁর কি জন্ম আছে, না কি মৃত্যু? ঈশ্বর যিনি তিনি তো জন্মরহিত, অবিনশ্বর, অব্যক্ত, নির্বিশেষ, নির্বিকার। ঈশ্বর যখন সাকাররূপ ধারণ করে আসেন এবং ব্যক্তস্বরূপে লীলাবেশ ধারণ করেন, তখন তিনি অবতাররূপে গণ্য হন। রামরূপে তিনি 'বারোয়ানা' আর কৃষ্ণরূপে তিনি 'ষোলোয়ানা অবতার'। অবতাররূপে যখন তিনি 'সর্ব অবতারী', তখনই তিনি 'অবতার- বরিষ্ঠ'।

১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরু হয়েছিলেন। বাঙ্গালি তথা বিশ্ববাসীকেই চৈতন্য জাগরণের আশীর্বাদ করেছিলেন। তাই তাঁর অবতারত্বে বাঙ্গালি অবগাহন করতে চেয়েছে চৈতন্যের সমুদ্রে। কিন্তু বেছে বেছে খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারের প্রথম দিনটিকে 'কল্পতরু'-র ভাব-আয়োজন কেন করলেন? কেনই-বা তাঁর প্রধান শিষ্য ১৮৮৬ সালের ২৪ ডিসেম্বর হুগলির আঁটপুরে সন্ন্যাসীর-ধুনি জ্বালালেন? কেনই-বা ১৮৯২ সালের ২৫ ডিসেম্বর কন্যাকুমারীর শিলাতে বসে অখণ্ড ভারতের সাধনায় নিমগ্ন হলেন? কেনই-বা কলোনিয়াল ফেস্টিভ্যালের মেজাজে প্রতিস্পর্ধী হিন্দুত্বের বাতাবরণ তৈরি হলো? কেন পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিধন্য হয়ে ১ জানুয়ারির মধ্যে হিন্দুয়ানির ব্যাপক ছোঁয়া লাগলো? এসব কি নিছকই এক একটি দিন, নাকি একটি প্রতিস্পর্ধী ধর্মের প্রভাব থেকে সনাতনী হিন্দু সমাজকে উত্তরণে নিয়ে যাওয়ার ঐশী-প্রয়াস? বাঙ্গালি কি কল্পতরু দিবস যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে দেখেছে? এই নিবন্ধ তারই অনুষঙ্গে রচিত। দেশীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষার ধারা পরিবর্তন করে মেকলে সাহেব ১৮৩৫ সালে যে শিক্ষানীতি প্রচলন করতে চাইলেন, পরের বছরেই তা ভাঙার আয়োজন হলো। ১৮৩৬ সালে জন্ম নিলেন পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ। 'তোমারে বধিবে যে/গোকুলে বাড়িছে সে।' কলোনিয়াল-কৌশল ভাবজগতে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি অপ্রকটের পূর্বে ঔপনিবেশিক ভাবধারাকে পরাজিত করে যাবেন, তা এক প্রকার নিশ্চিতই ছিল। তাই দেখা গেল ১৮৮৬ সালে ১ জানুয়ারি থেকে খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারের পাতায় জ্বলজ্বল করছে এক অহৈতুকী কৃপালাভের আনন্দঘন দিন। কল্পতরু উৎসব। ভারতবর্ষ আপন সৌকর্যে অতিক্রম করেছে সাম্রাজ্যবাদের চিহ্নমাখা দিন।

এখন হিন্দুসমাজের কাছে কল্পতরু উৎসব কেন তাৎপর্যপূর্ণ? কারণ এটি খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারের প্রথম দিবস, বড়োদিন থেকে শুরু হওয়া উইন্টার ফেস্টিভ্যালের গুরুত্বপূর্ণ দিন। ইংরেজি বর্ষবরণের দিন। আর প্রথম দিনেই কলোনিয়াল ফেস্টিভ্যাল বোল্ড আউট হয়ে গেল হিন্দুয়ানীর পবিত্র ছোঁয়ায়। রক্তপাতহীন নীরব এক আধ্যাত্মিক যুদ্ধ। এর নাম স্পিরিচুয়াল রেভোলিউশন। এটা যে কত বড়ো জয়, তা যতই সময় পেরোবে, ততই অনুভূত হবে।

প্রথমে আলোচনা করব শ্রীরামকৃষ্ণ কেন

অবতার? কারণ তাঁর মধ্যে ত্যাগের অপরিসীম শক্তি তীব্র প্রখরতায় বিচ্ছুরিত হয়েছিল। তাঁর মধ্যে মৃত্যুতুল্য সমাধিস্থ থাকার অসামান্য ক্ষমতা ছিল। ছিল স্পর্শ দ্বারা অন্যকে আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে জারিত ও সঞ্জীবিত করার অলৌকিক ক্ষমতা। সদাসর্বদা সতত দেবত্বের উপলব্ধি ছিল তাঁর। ছিল সাধন-শিখরের চূড়ায় পৌঁছানোর নজির। যুগের বিশেষ প্রয়োজনেই তাঁর মর্ত্যে আসা। ১৮৩৫ সালে মেকলের ভারতীয় সংস্কৃতি-বিধ্বংসী শিক্ষা ব্যবস্থা স্থাপনার পরের বছরই তাঁর আবির্ভাব। একজন কেতাবি-বুদ্ধি-রহিত গ্রাম্যযুবক কী করে লাভ করেছিলেন শাস্ত্রবিচারের অনন্য জ্ঞানভাণ্ডার? কী করে অনন্ত-অমৃতলোকের চাবিকাঠি দুই কাঁধের বিবেক-বৈরাগ্যের ঝোলায় নিত্য ঝুলিয়ে রাখতেন?

গীতার জ্ঞানযোগের ষষ্ঠশ্লোকে আছে 'অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপিসন। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।।' আমি জন্মরহিত, আমার চিন্ময় দেহ যদিও অব্যয়; যদিও আমি সর্বভূতের ঈশ্বর, তবুও আদি চিন্ময়রূপে আমার অন্তরঙ্গ শক্তিকে আশ্রয় করি এবং যুগে যুগে আবির্ভূত হই। ঈশ্বরের এই আবির্ভূত সত্তাই হলেন অবতার। তিনি 'কর্মহীন', অর্থাৎ কর্মফলের জন্য তাঁকে ধরাধামে আসতে হয়েছে, তা নয়। তিনি কৃপা করেই আসেন, মানব কল্যাণের জন্যই আসেন এবং মানুষের দেহ ও মন নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন। কোনো মায়াডোর তাঁকে বেঁধে রাখতে পারে না, তিনি 'মায়াধিপতি'। পুণ্যাত্মা সাধক আর অবতার অভিন্ন পদবাচ্য নয়।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরের ভরা নাটমঞ্চে প্রথিতযশা পণ্ডিতদের মাঝখানে যেদিন নানান প্রমাণ-সহ তাঁর অবতারত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন, সেদিনও কি সমকাল বুঝেছিল তাঁর সংজ্ঞা, স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য? দ্ব্যর্থহীনভাবে বুঝলেন তখনই যেদিন তিনি নিজে আত্মপ্রকাশ করে অভয়দান করলেন। যেদিন অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু হয়ে, পতিতপাবন রূপে নিজেকে শীতের এক বিকেলে অনাবৃত করলেন। ভক্তরা দেখতে পেলেন অবতারের রূপমাধুরী— 'মনে হয় অঙ্গবাস সব দিয়া খুলি।/ নয়ন ভরিয়া দেখি রূপের পুতুলি।' সেটা ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি। কলকাতার কাশীপুর উদ্যানবাটি। যেদিন তিনি অন্তরঙ্গ-পার্ষদ ও ভক্তমণ্ডলীর কাছে অভাবনীয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করলেন।

এবার আলোচনা করবো কল্পতরু-লীলা। এই লীলা-কাহিনি নানান গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন স্বামী সারদানন্দ রচিত 'লীলাপ্রসঙ্গ'-এ, কবি অক্ষয়কুমার সেন বিরচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি'-তে, শ্রীম কথিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'-এ। নিবন্ধে স্বামী অভেদানন্দ রচিত 'আমার জীবনকথা' গ্রন্থের বিবরণ কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন গলায় দুরারোগ্য কর্কটরোগে আক্রান্ত। সেদিন অফিস ছুটির দিন। বিকেলে বাগানবাটিতে এসেছেন গিরিশ ঘোষ-সহ গৃহস্থ ভক্তরা। সেবক-পার্ষদরাও রয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এদিন কিছুটা সুস্থ অনুভব করে দোতালা থেকে নীচে নেমে বাগানে হাঁটছেন। এরই মধ্যে গিরীশ ঘোষের সঙ্গে কথা হলো। ঐশী সংলাপে ঠাকুর বাহ্যজ্ঞানশূন্য হলেন। ভাবাবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। সংজ্ঞালাভ করে সবাইকে আশীর্বাণী দিলেন— 'তোমাদের চৈতন্য হোক'। সকলকে স্পর্শ করলেন, তাদের অধ্যাত্ম-আঁখি খুলে দিলেন, সকলের সকল প্রার্থনা পূরণ করলেন। 'ভাই ভূপতি সমাধি প্রার্থনা করিয়াছিল। তাহাকে শ্রীশ্রীঠাকুর কৃপা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তোর সমাধি হবে'। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত গরিব অবস্থায় অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছিলেন বলিয়া অর্থ প্রার্থনা করিয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে কৃপা করিয়া বলিলেন, 'তোর অর্থ হবে।' রামলালদাদা, বৈকুণ্ঠ সান্যাল প্রভৃতি গৃহস্থ-ভক্তদিগকে তাহাদের যাহা যাহা প্রার্থনা ছিল, তাহা তিনি আশ্বাস দিয়া 'পূর্ণ হবে' বলিয়া কৃপা করিলেন।'

এখন কেক পেস্ট্রি, নেটিভেটি ও ক্রিসমাস ট্রি-র আলোকমালায় হিন্দুরা যখন দিশেহারা, তখন স্বভাবতই আবারও প্রশ্ন ওঠে, স্বামীজী কি বলেছেন ঘটা করে বড়দিন উৎসব পালনের কথা? এদিন কি আমাদের বাইবেল পাঠ করে যিশুর জন্মদিন পালন করতে হবে?

ব্রিটিশ শাসনে থেকে স্বামীজীও হয়তো খ্রিস্টীয় পরিমণ্ডল অতিক্রম করার জন্য তাদের সেরা দিনটিকেই গ্রহণ করেছিলেন। দিনটির মধ্যে হিন্দুধর্মের নবযুগের ইতিহাস রচনার বীজ বপন করতে চেয়েছিলেন। অস্বীকার করার উপায় নেই, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তনীয়া। শিকাগোতে তিনি হিন্দুধর্মের প্রচারের জন্যেই গিয়েছিলেন। খ্রিস্টান মিশনারিদের সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, ভারতবর্ষ কখনই অধ্যাত্মসম্পদে দরিদ্র নয়, দরিদ্র অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানে। তাই ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ সালের শিকাগো ভাষণে বলছেন, 'তোমরা খ্রিস্টানরা পৌত্তলিকদের আত্মাকে উদ্ধার করবার জন্য তাদের কাছে ধর্মপ্রচারক পাঠাতে খুবই উৎসাহী, কিন্তু বলো দেখি অনাহার ও দুর্ভিক্ষের হাত থেকে দেহগুলো বাঁচানোর জন্য কোনো চেষ্টা কর না কেন? ভারতবর্ষে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের সময় হাজার হাজার মানুষ খিদেয় মৃত্যুমুখে পড়ে, কিন্তু তোমরা খ্রিস্টানেরা কিছুই করনি। তারা ভাত চাইছে আর আমরা তাদের পাথরের টুকরো তুলে দিচ্ছি। ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের কথা শোনানো বা দর্শনশাস্ত্র পড়ানো হলো তাকে অপমান করা।'

মনে রাখতে হবে, স্বামীজী অন্য ধর্ম থেকে ভাব নেবার ব্যাপারে selective ছিলেন। যিশুর সামাজিক সাম্যনীতি তাঁর প্রাণ স্পর্শ করে থাকবে; জগতের কল্যাণের জন্য যে ত্যাগ দরকার হয়, তার রসদও যিশুখ্রিস্টের মধ্যে তিনি পেয়ে থাকবেন।

ঔপনিবেশিক শাসনে থাকবার পর মানুষ স্বভাবতই তাদের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়, নতুবা নানান মত ও পথে তা অতিক্রমণ করতে মনস্থ হয়, কখনও কখনও ঔপনিবেশিক শক্তির মান্য ধর্মকে তীব্রভাবে অস্বীকার করার মানসিকতা জন্মায়। ব্রিটিশ শাসনে থেকে স্বামীজীও হয়তো সেই ধর্মীয় পরিমণ্ডল অতিক্রম করার জন্য তাদের ধর্মীয় সেরা দিনটিকেই গ্রহণ করেছিলেন। আর সেই দিনটির মধ্যে হিন্দুধর্মের নবযুগের ইতিহাস রচনা করতে চাইলেন। এখানে তাঁর পথপ্রদর্শক গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনিই তো ১ জানুয়ারি কল্পতরু হয়ে পথ দেখালেন তাঁকে।

১৮৮৬ সালের বড়দিনের পূর্বসন্ধ্যায় (১৩ পৌষ, ১২৯৩) ন'জন গুরুভাই হুগলীর আঁটপুর গ্রামে বাবুরাম ঘোষের (শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ পরবর্তীকালে স্বামী প্রেমানন্দ) বাড়িতে উপস্থিত হয়ে ভারতের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক কল্যাণে সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প করলেন। অন্যদিনও তো করতে পারতেন, কারণ আঁটপুরে তার বেশ কয়েকদিন আগেই তিনি পৌঁছেছিলেন। মনে রাখতে হবে, ১৮৮৬ সালেই আগস্ট মাসে ঠাকুরের শরীর যায়। সেদিন অশ্বত্থতলায় ধুনি জ্বেলে তাঁরা বসলেন গভীর ধ্যানে, ঈশ্বর আলোচনা করলেন। স্বামীজী যিশুখ্রিস্টের কথাও সেদিন বললেন। এখন প্রশ্ন এইভাবে দিনটি পালনের পরও পরবর্তীকালে পুরীতে গিয়ে সেই বাবুরাম মহারাজই কেন খ্রিস্টান পাদরিদের ধর্মপ্রচারের জনসমাগমকে বিভ্রান্ত করার জন্য এবং স্বধর্ম চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য 'হরিবোল হরিবোল হরিবোল' ধ্বনি দিয়ে উত্তাল করেছিলেন এবং উপস্থিত মানুষকে তাতে শামিল করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, আর তাতে সফলও হয়েছিলেন? তার মানে স্বামী বিবেকানন্দ এমন কোনো দাগ তার মধ্যে রেখে যায়নি, তাতে এটাকে স্বধর্ম প্রীতির বাইরে কিছু ভাবতে পারেন। যদিও এরপর স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসে তাঁর

ভুল ভাঙালেন, এমন ব্যাখ্যা আছে।

দ্বিতীয় ঘটনা ১৮৯২ সালের ২৫, ২৬, ২৭ ডিসেম্বরের; স্থান কন্যাকুমারী। আবারও ২৫ ডিসেম্বরকে ব্যবহার করলেন স্বামীজী। তিনি অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ডাইনে-বামে-পশ্চাতে ঢেউ আর ঢেউ, অগণিত অনন্য; মহাসাগরের বুকে মিশে যেতে চায় সাগর আর উপসাগর— অনাদিকাল থেকে তাদের অভিসার যাত্রা। ১৮৯২ সালের ২৫ ডিসেম্বর; আকাশের এক তারা এসেছেন মর্ত্যসাগরের ত্রিকোণ প্রেমের জলধারায় নীলকর দিয়ে। সুনীল জলধি থেকে সন্তানসম ভারতবর্ষের আবির্ভাব; মহাকালের সেই মহান অধ্যায় দেখতে এসেছেন সপ্তর্ষিমণ্ডলের এক আশ্চর্য নক্ষত্র; তার অতীত আর ভবিষ্যৎ মেলাবেন সমাধিতে বসে। পাশেই সমুদ্র-তনয়া কন্যাকুমারী। বড়দিনই বটে, তার প্রাক্কালে পায়ে হেঁটে কন্যাকুমারী পৌঁছলেন তিনি; দেখলেন অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন, তারপর অতুল্য কিন্তু অভুক্ত ভারতের জন্য গ্রহণ করলেন এক আধ্যাত্মিক সংকল্প। ধ্যানের শঙ্খনাদে একাদিক্রমে তিনদিন কাটলো— ২৫, ২৬, ২৭ ডিসেম্বর। যে খ্রিস্টান ধর্ম মানুষকে 'পাপী' বলে, সেই ধর্মের প্রতিবাদ কেবল স্বামীজীই করেননি, করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবও। মানুষ দেবতা, মানুষ ব্রহ্ম; সে পাপী হবে কীভাবে? সে অমৃতের সন্তান, সে পবিত্র, সে পূর্ণ, পূর্ণতা প্রাপ্তির সব যোগই তার মধ্যে আছে।

শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মসমাজের শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিন্দু বিধবা আশ্রমের জন্য তিনি বিদেশে বক্তৃতা দিয়ে টাকা তুলে পাঠিয়েছেন কেবল খ্রিস্টান ধর্মান্তরিত ভারতীয় বিদুষী মহিলা রামাবাইয়ের তৈরি বিধবা আশ্রমকে ঔচিত্য দেখানোর জন্য। কারণ এই মহিলা-সহ অন্যান্য খ্রিস্ট-ধর্মাবলম্বী ও মিশনারিরা গলা ফাটিয়ে ভারতীয় বিধবাদের দুঃখের অতিরঞ্জন করতেন, স্বামীজীর তা না-পসন্দ ছিল।

হিন্দু ধর্মের প্রচারে আনুকূল্য পাবার জন্য যতটুকু যিশু-ভজনা দরকার স্বামীজী তাই করেছেন। তিনি জানতেন একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবমহামণ্ডলে ভারত-সহ প্লাবিত হবে বিশ্বের নানান অংশ। তাই বড়দিনের মতো দিনটির মধ্যে হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তনের বীজ বপন করেছিলেন তিনি। এটা কলোনিয়াল প্রভাবমুক্তিরই সাধনা— সাধনা ২৫ ডিসেম্বরকে অতিক্রমের। এই দিনে বরং বেশি করে শ্রীরামকৃষ্ণের ও স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণ-মনন ও পূজন জরুরি। জরুরি শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামীজী যুগলবন্দির আরাধনা।

ঔপনিবেশিক খ্রিস্টান ধর্ম ও সংস্কৃতিকে যেমন ভাবে অতিক্রম করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর প্রিয় শিষ্য। সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের দিবসটিও হয়তো একদিন অতিক্রান্ত হয়ে সনাতনী পরত মেখে যাবে। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে পিতা-মাতার অকৃত্রিম স্নেহাশীর্বাদ, ঈশ্বর জ্ঞানে তাদের পূজনের দিন। এরকম একটি দাবিও উঠেছে।

ভালোবাসার জয় এভাবেই হবে। পিতা-মাতাকে ভালোবাসার দিন, স্বামী-স্ত্রী, সংসার পরিজন, পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রীকে ভালোবাসার দিন হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি। ঔপনিবেশিকতার পরাজয় ঘটবে। আর পহেলা ফাল্গুন অশোক ফুলের মঞ্জরী দিয়ে পালিত হবে ভারতীয় প্রেমের দিবস বসন্তোৎসব।

চেতনার চৈতন্যে পঁচিশে ডিসেম্বরকে হিন্দুরা তুলসীপূজন দিবস হিসেবে মান্যতা দিয়েছেন। কারণ ভারতবাসীর অন্তরে প্রশ্ন জেগেছে, সজ্জিত-নির্জীব 'ক্রিসমাস ট্রি'-র চাইতে জীবন্ত-বীরুৎ তুলসী কেন আমাদের আরাধ্য হবে না! তার সুবাস, তার নির্যাস, তার বাতাস কেবল অতি পবিত্র নয়, অতীব ভেষজগুণ-সম্পন্ন। ভারতবাসীর বৃক্ষপূজার ধারণা তো নতুন নয়, উদ্ভিদের মধ্যেকার চৈতন্যও নতুন নয়। শীতের ঝকমকে রোদে যখন তুলসীমঞ্চ আলো করে পুষ্পমঞ্জরী পেকে ওঠে, বীজ পুষ্ট হয়, তখন তার বীজ সংগ্রহ করে রাখতেন গৃহস্থ পরিবার। ক'দিন সুপ্তির পর বসন্ত এলেই তা থেকে বেরিয়ে আসতো নতুন চারা। মন্দিরের এক চিলতে জমিতে 'তুলসীতে তুলসীতে বৃন্দাবন' হয়ে যেতো। তারই শুভসূচনা ২৫ ডিসেম্বর। ভারতবাসীর কাছে তুলসী মাহাত্ম্যে 'বড়দিন'-ই বটে। শরতের দিনে যে চারা বড়ো হয়ে উঠতো, মাটির মণ্ডে শিকড় সমেত তা এদিন স্বজন-বান্ধব, প্রতিবেশীকে বিতরণ করা ছিল পবিত্র কর্তব্য। আর পরিবেশিত হতো নলেন গুড়ের শালিধান্যে রাঁধা পরমান্ন। কোনও কেক-পেস্ট্রি স্বাদে গন্ধে তা অতিক্রম করতে পারেনি। অনতিক্রম্য এক দিবস— তুলসী-পূজন।

লোকহিতে তিনি হলেন কল্পতরু

নন্দলাল ভট্টাচার্য

মনে হয় বুঝি অকস্মাৎ। কিন্তু তা তো নয়। এটাই তো অবধারিত, অষ্টমীর পর নবমী, সেই নবমী নিশিও বুঝি যায়। শেষ আরতির ঢাকের বাদ্দিতে বিপদের সুর। আনন্দের বেহাগে পূরবীর কান্না।

পূজা হলো সমাপন। এবার বিসর্জন। চরৈবেতির পথে এই তো নিয়ম। তাই বুঝি শান্তি বারি সিঞ্চন। শান্ত হও। শান্তি পাও। মঙ্গলে মঙ্গলে আসুক বুধের উষা। পূর্ণ হতে যাও পূর্ণতার দিকে। এমনই চিরন্তন ধারার তরঙ্গে তরঙ্গে কত না রঙ্গ। সেই রঙ্গ বেদনার। সেই রঙ্গ আনন্দের। পরম প্রাপ্তির। পূর্ণকাম হওয়ার মধুর লগন।

চলছে মন্থন। মহা সমুদ্রে। হলাহল নয়, চাই অমৃত। তাই দেবাসুর মিলে মিশে একাকার। ক্ষীরোদ সাগরে কূর্মরূপী বিষ্ণুর পিঠে মন্দার পর্বত। তাকে ঘিরে শেষনাগের পাক। সে যে মন্থন দড়ি। তার দু'প্রান্তে সুর ও অসুর। তাদের শ্রান্তিহীন টানে টানে ঘুরছে মন্দার, সংক্ষুব্ধ সাগর থেকে উঠছে রত্নরাজি। তবুও নেই বিরাম। অমৃত চাই— অমৃত। তাই তো এখন বিষম পাক।

সেই পাকেরই এক ফাঁকে উঠল কামধেনু। উঠল কল্পবৃক্ষ— কল্পতরু-কল্পদ্রুম-কল্পপাদপ। কত না নাম— সে পুরায় সর্ব মনস্কাম। তাই ইন্দ্র নিলেন তাকে। রাখলেন তাঁর পঞ্চ উদ্যানে। এ এক আশ্চর্য তরু। অবারিত-অবাধ-মুক্ত। নেই কোনো বিচার। তাই তো কত সাবধানতা। পুরাণ বলে, নিঃসঙ্গ পার্বতী। তাঁর সে নিঃসঙ্গতা ঘোচাতেই এই বৃক্ষ হলো আশোকা সুন্দরী।

অন্য কথা। কন্যা অরণ্যানী। শিব-দুর্গা পান না খবর বহুদিন সে কন্যার। তাইতো শরণ এই কল্পতুরুর। মুহূর্তে এল খবর— নিরাপদে আছে কন্যা। প্রজ্ঞা, সুস্বাস্থ্যবতী, নানা সম্পদশালিনী সেই কন্যাই বনদেবী। আনন্দমুখর জনকজননী।

মেরু পর্বতে ইন্দ্রের কানন। সে কাননে প্রতিস্থাপিত মহাকল্পদ্রুম। সেখান থেকেই ক্বচিৎ কখনো কোনো এক শুভ লগ্নে তিনি আসেন মর্ত্যে— মোক্ষ সকলের কামনা। কামনা পুরণেরই তিনি বৃক্ষ হলেন। এবার তাঁর কৃপা বিতরণ কাশীপুর উদ্যানবাটিতে। সেখানে তিনি হলেন কল্পতরু।

একদা সাধনা শেষে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের ছাদে উঠে সে কী আর্ত চিৎকার তাঁর— ওরে আয়—আয়। আসে ভক্তের দল। আর পাপহরণ তিনি— করুণার অবতার গ্রহণ করেন সকলের পাপ— বিতরণ করেন অমৃত।

কিন্তু কে দেবে তার মূল্য। তাই তো মহেশ্বরের মতোই কণ্ঠে ধারণ করলেন তিনি হলাহল। আক্রান্ত হলেন প্রাণঘাতী কর্কট রোগে। যে কণ্ঠে সকলকে আহ্বান— তাতেই বাসা বাঁধে মারণ রোগ। ভয়ংকর যন্ত্রণা। প্রাণ বুঝি যায়। তবু তিনি নির্বিকার। কৃপা বিতরণের জন্যই অবতরণ— তাই তো তিনি অবতার। তাই তো তাঁর এত লীলা।

সেই লীলারই দৃশ্যান্তরে দক্ষিণেশ্বর থেকে তাঁকে আনা হলো কলকাতায়। প্রথমে বাগবাজারে বলরাম ভবন— শ্যামপুকুর বাটিতে। কিন্তু তিনি তো বদ্ধ নন। ইট কাঠ সিমেন্টের বাড়িতে যেন বন্ধ হয়ে আসে শ্বাস। তাঁর চাই উন্মুক্ত উদার আকাশের নীচে সুবাসিত উদ্যানে, কোনো এক তপোবন।

তাঁর চাওয়াই তো পাওয়া। ১৮৮৫-র ডিসেম্বরে ভক্তরা পেলেন তাঁর সেই আশ্রমের সন্ধান। ১১ ডিসেম্বর তাঁর পদার্পণ ঘটল কাশীপুরে গোপাল ঘোষের সেই বাগানবাড়িতে। ধন্য কাশীপুর। বাগানবাড়ি হলো উদ্যানবাটি। সেখানেই আছেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ। আছেন মা সারদা। আর তাঁর সেবার জন্য আছেন একজন আত্মত্যাগী তরুণ ও গৃহী ভক্তের দল। এই গৃহী ভক্তরা নিত্য আসেন, কিন্তু তরুণরা ছাড়েন না তাঁর সঙ্গ। রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁরাও সেই উদ্যানবাসী।

চলছে চিকিৎসা। কিন্তু সূর্য তখন রাত্রিগামী। তাই আলোর নেই সেই দীপ্তি। আশার প্রদীপের তেল যেন নিঃশেষের পথে। কিন্তু তাঁর লীলার নেই শেষ। নিত্য নবরঙ্গে রঙ্গময় তিনি। চিহ্নিত এগারো সন্তানের হাতে তুলে দিলেন গেরুয়া বস্ত্র। নিজ হাতে সুচনা

করলেন এক মহাসঙ্ঘের। আগামীর এক মহা আশ্রমের।

তারপর। তারপরও হলো না শেষ দেওয়া। এখনও যে আছে আরও কিছু বাকি। যাঁরা সন্ন্যাস নিয়ে একদিন সারা বিশ্বে তুলবেন আলোড়ন, বেদান্তের বাণী দেবেন ছড়িয়ে, বিশ্বমানবপ্রেমে শিবজ্ঞানে করবেন জীবসেবা। যত মত তত পথের তত্ত্বকে করবেন প্রতিষ্ঠিত, তাঁদের তো চেনা হয়ে গেছে। সঞ্চারিত করা হয়েছে শক্তি। দেখানো হয়েছে অধ্যাত্মসাধনার দিশা। সেই দেওয়ার সূত্রে তিনি তো ফকির। তবুও— তবুও আর কিছু আছে বাকি।

গৃহী যাঁরা--- গৃহে থেকেই যাঁরা জীবজগৎকে আলোকিত করেন, তাঁরা কেন থাকবেন বঞ্চিত? কেন পাবেন না তাঁরা তাঁর ঐশী পরশ— কেন তাদের জন্য খোল হবে না অমরার পথ। গৃহে থেকেও যাঁরা হবেন পাঁকাল মাছের মতোই অকলুষ, নির্মল, যাঁদের মধ্যে বাস সেই একই ঈশ্বরের, তাঁদেরও জাগাতে হবে। ঘটাতে হবে শক্তির স্ফুরণ। আর তাই তিনি সাজলেন।

সেদিন ১৮৮৬-র পয়লা জানুয়ারি। ইংরেজি নববর্ষের এক পুলকিত সময়। মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের রথ তখন ছুঁই ছুঁই পশ্চিমের দিগন্ত রেখা। দূর থেকে ভেসে আসে গড়ের মাঠের গোরাদের যন্ত্রের ঐকতানের সুর। সে সুর বুঝি মাতন তুলেছিল কাশীপুর উদ্যানবাটিতেও। সকাল থেকেই বহমান প্রফুল্ল সুবাতাস। ঠাকুর যে ভালো আছেন। আর তাতেই সকলেরই অন্তরে ভালো থাকার এক অলৌকিক অনুভব।

দিন গড়ায়। ঠাকুর রামকৃষ্ণও সকলের ভালো লাগার আনন্দে লীন। কিছু দেবার উল্লাস তখন হৃদয়ে। আর তাই বিকেলের রোদে যখন লাগে শীতের আমেজ জড়ানো শীতলতা— তখনই শোনা যায় তাঁর কণ্ঠ, —কই, কোথায় আমার কাপড়? কোথায় পিরান? কোথায় লাল পেড়ে চাদর? কোথায় আমার কান ঢাকা টুপি? আমি যে আজ সাজব। তাড়াতাড়ি আনো আমার সাজ।

দোতলার ঘরে সাজলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ। যেন মোহন বেশ। পাটভাঙা ধুতি, পিরান, চাদর আর কানঢাকা টুপিতে। পা গলালেন চামড়ার চটিতে। তিনি তখন মনোমোহন। নিজের রূপ দেখে ক্ষণিকের জন্য তিনি অরূপ লোকবাসী। ঘরে যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও তাঁর সে রূপ দেখে আনন্দ বিহ্বল।

পা বাড়ালেন তিনি সিঁড়ির দিকে। তখনই যেন ফেরে সকলের সংবিৎ। এ কী, কোথায় চলেছেন।

—আমি নীচে যাব। বাগানে বেড়াব।

—কিন্তু আপনার অসুস্থতা? দুর্বলতা?

—না— নেই। কিছু নেই, আজ আমি অবারিত সদাব্রত। আমি আজ নীরোগ— উদার-উন্মুক্ত।

ঠাকুর নামছেন সিঁড়ি ভেঙে। সঙ্গে লাটু। কিন্তু তিনি নামলেন স্বাভাবিকের পথেই।

নীচের ঘরে তখন কয়েকজন গৃহী ভক্ত। ঠাকুরকে দেখে সঙ্গ নিলেন তাঁরা। বাগানে ছিলেন আরও কিছু ভক্ত। মিললেন তাঁরাও। লাটু তাই নিশ্চিন্ত। ফিরে গেলেন উপরেই।

ঠাকুরকে ঘিরে তখন ভক্তের দল। দু'চোখ ভরে দেখলেন— দেখছেন এক দেদীপ্যমান সূর্যকে। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাকে। দেখছেন অকলঙ্ক চন্দ্রকে। অতলান্ত এক মহাসমুদ্রকে। দেখছেন এক সুবিশাল শৈলাদ্রিকে। আশ্চর্য শীতল এক পাবককে।

সে দর্শনে শুধুই জিজ্ঞাসা। অনন্ত প্রশ্ন, কে উনি? মৃত্যুর মুখেও অমৃত।

অন্ধকারে আলোক। হতাশায় আশা।

যন্ত্রণার মুহূর্তের আনন্দময়, হাস্যময়। ওই বিরাট— বিশালকে দর্শন করতে করতে মন সন্ত্রস্ত-সচকিত। হয় সংকুচিত আবার উন্মুক্ত। নির্বাক মন অন্তরে মুখর এক প্রার্থনায়। তোমাকে দেখার--- বোঝার--- জানার, তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করার শক্তি দাও। নয়ন দাও আমাদের।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কিন্তু সেই নীরব-সরব প্রার্থনার মধ্যেও স্বাভাবিক। এগিয়ে যান দক্ষিণের ফটকের দিকে। প্রায় মাঝামাঝি এসে দেখেন পশ্চিমে গাছের তলায় বসে আছেন গিরিশ, রাম দত্ত, অতুল ও আর কয়েকজন। এগিয়ে গেলেন তাঁদের দিকে। স্ফুরিত হলো কণ্ঠ, গিরিশ, তুমি যে বলে বেড়াও— আমি নাকি অবতার— বিরাট— আরও কত কী। কিন্তু কী দেখেছ তুমি আমার — কী বুঝেছ?

গিরিশ নির্বাক। ভাবে গদগদ। বলেন, ব্যাস বাল্মীকি যাঁর অন্ত পাননি, আমি তাঁর সম্পর্কে বেশি কী বলতে পারি? সে কথায় ভাবগম্ভীর ঠাকুর। উচ্চভূমে তাঁর অবস্থান। তিনি হলেন সমাধিস্থ। ওদিকে বলে চলেছেন গিরিশ— জয় রামকৃষ্ণের জয়, জয় রামকৃষ্ণের জয়। সেই জয়ধ্বনিতে মিলল আরও আরও কণ্ঠ। মা-জাগো— মা জাগো বলে হাত তুললেন ঠাকুর। অর্ধ বাহ্যদশায় মধুর কণ্ঠে উচ্চারিত হলো বাণী— তোমাদের আর কী বলব? আশীর্বাদ করি, তোমাদের চৈতন্য হোক।

ভক্তরা ভুললেন আগের প্রতিজ্ঞা। ঠাকুর সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত স্পর্শ করবেন না তাঁকে এ শপথ ভুলে আত্মহারা তাঁরা লুটিয়ে পড়লেন তাঁর পায়ে। চৈতন্যময় হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তাঁর পা তুলে নেন বুকে। সেই দিনের সেই মুহূর্তে রামলাল দেখলেন তাঁর ইস্টকে। রাম দত্ত, অক্ষয় সেন তাঁর পায়ে দেন পুষ্পাঞ্জলি। আর স্মিত হাস্যে তিনি সকলকে বলেন, চৈতন্য হোক তোমাদের।

আবেগে মুখর অক্ষয় সেন,— ওরে কে কোথায় আছিস আয়— ছুটে আয়— ঠাকুর আজ আমাদের কল্পতরু হয়েছেন। এদিন আর পাবিনে— যার যা চাওয়ার চেয়ে নে। তাঁর স্পর্শে বৈকুণ্ঠ সান্যাল তিন দিন থাকলেন ভাববিভোর। মুখে রব— ওরে কে কোথায় আছিস আয়— অমৃতময়কে স্পর্শ করে ধন্য হ'। সেদিন, ঠাকুরের যাঁরা সন্ন্যাসী ভক্ত— তাঁরা কেউ কিন্তু এলেন না। বরং ওই সময় তাঁরা ওপরে পুলকিত মনে— ভক্তির আবেশে গোছাতে থাকেন ঠাকুরের ঘর। সেবার মধ্য দিয়ে আরও নিবিড়, আরও কঠিন পাকে বাঁধতে থাকেন তাঁরা তাঁদের জীবনদেবতাকে অন্তরের গভীরে।

মরলোকে ঠাকুরের জীবনের শেষ ১ জানুয়ারি। যাওয়ার আগে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিশেষ ভাবে কৃপা করলেন তাঁর গৃহী ভক্তদের। অফুরন্ত এক কৃপার বন্যা বয়ে গেল। শুধু সেদিন নয়— চিরকালের জন্য।

১৮৮৬-র ১৬ আগস্ট তিরোভাব ঘটে শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু আজও ভক্তের দল তাঁর অলৌকিক ওই কৃপার স্পর্শে ধন্য হবার জন্য— সব পার্থিব বাসনার সঙ্গে সঙ্গে অপার্থিব চাওয়া পাওয়া— সেটি নেবার আশায় জড়ো হন কাশীপুর উদ্যানবাটিতে, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এবং তাঁর লীলাধন্য আরও নানা স্থানে। অনুভব করেন তাঁর কৃপা— তাঁর ঐশী লীলামাহাত্ম্য।

হিন্দু সমাজ সতর্ক হলেই ঘটবে চৈতন্যের জাগরণ

রামানুজ গোস্বামী

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি, ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিন। এই দিনটি হিন্দুসমাজের কাছে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। এর তাৎপর্য ধর্মপ্রাণ হিন্দু ভক্ত মাত্রেই অবগত আছেন। বিশেষত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুগামীরা এই দিন কল্পতরু দিবস বলে পালন করে থাকেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই দিন কাশীপুর উদানবাটিতে কল্পতরু হয়েছিলেন। শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে কল্পতরু বা কল্পবৃক্ষের কথা। এই বৃক্ষের কাছে যে যা কিছুই প্রার্থনা করে, সে তাই প্রাপ্ত হয়। উক্ত দিনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবও গৃহস্থ ভক্ত-শিষ্য তথা পার্ষদদের কাছে কল্পতরু হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, এটা উল্লেখ্য যে, ওই দিনে ঠাকুরের কল্পতরু-লীলাস্থলে তাঁর ত্যাগী তথা সন্ন্যাসী শিষ্য বা পার্ষদেরা কেউই উপস্থিত ছিলেন না। তাই এই কথা বলা যেতেই পারে যে, ওই দিন তিনি বিশেষভাবে গৃহী ভক্তদের উদ্দেশেই কৃপাবর্ষণ করেছিলেন।

হিন্দু যুবসমাজের একটা খুব বড়ো অংশও আজ সনাতন ধর্মের সঙ্গে একেবারেই সম্পর্কহীন। এদের না আছে কিছুমাত্র হিন্দুধর্ম বা হিন্দুশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান, না আছে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা। তার প্রতিফলন এদের সামাজিক ব্যবহার, রাজনৈতিক মতামত, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, বিনোদন, রুচি বা পছন্দ— এককথায় সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়।

যারা শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু হওয়ার ঘটনা বিশদে পড়েছেন বা জানেন, তারা একথা তো অবশ্যই অবগত আছেন যে, তিনি সেদিন যে যা কিছুই প্রার্থনা করেছিল, তাকে তাই প্রদান করেছিলেন। যে অর্থ প্রার্থনা করেছিল, তাকে তিনি ধনশালী হওয়ার বরপ্রদান বা আশীর্বাদ করেন। আবার অন্যদিকে যে বা যারা পরমার্থ লাভ বা ঈশ্বরলাভের জন্য প্রার্থনা করে, তাদের সেই প্রার্থনাও তিনি পূরণ করেছিলেন। বস্তুত এই যে এক মহান ঐশ্বরিক লীলার প্রকাশ, তাকে 'আত্মপ্রকাশে অভয়দান' বলেও অভিহিত করা হয়েছে। এর অর্থ এটাই যে, ওই দিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর ঐশ্বরিক সত্তার সম্পূর্ণ প্রকাশ করেছিলেন উপস্থিত ভক্তদের সম্মুখে এবং তাদের অভয়প্রদান করেছিলেন। তাঁর কল্পতরু হওয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে কমেবেশি সকলেরই জানা আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু-লীলার মর্মবাণী রয়েছে তাঁর সেই সুবিখ্যাত উক্তিতে— 'তোমাদের কী আর বলিব, আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হউক'। একথার প্রাসঙ্গিকতা তথা তাৎপর্য নিয়েই এই নিবন্ধের অবতারণা।

চৈতন্য যার আছে, সে হলো সচেতন বা চেতনাসম্পন্ন; অন্যদিকে যার চেতনা বা চৈতন্য নেই, তাকে বলা হয় অচেতন বা অচৈতন্য। কথাটা এই যে, যার চেতনা নেই, তার বেদনাও নেই। বহুকালের প্রাচীন এই প্রবাদবাক্য জনৈক প্রবীণ শিক্ষকমহাশয়ের কাছে শোনা; এর অর্থ কিন্তু সুদূরপ্রসারী। তাই এই কথা বলা যেতেই পারে যে, চৈতন্যের জাগরণ না ঘটলে মানুষের সমস্ত কর্মই বৃথা হয়ে যায়। কথাটা এভাবেও ভাবা যেতে পারে যে, চৈতন্যহীন ব্যক্তি তো নিতান্তই জড়পদার্থের মতোই, জড়বস্তুর থেকে তো কিছু আশা করাই অনুচিত, কারণ তা তো নিষ্প্রাণ। তাই চেতনাহীন মানুষও আসলে কতকটা ওই জড় পদার্থের মতোই। আপাতভাবে এটা মনে হতেই পারে যে, তা কেমন ভাবে সম্ভব। বস্তুত, চৈতন্যহীন মানুষের বিবেক বা বুদ্ধি বলে কিছুই থাকে না, থাকে না ভালো-মন্দ বোঝার বা চেনার ক্ষমতাও। তাই সে, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়, শত্রুকে মিত্র আর মিত্রকেই শত্রু বলে ভাবতে থাকে।

যদি আমরা একটু সনাতন ধর্ম বা হিন্দু ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা

করি, তবে এটাই দেখব যে, হিন্দুধর্মে পরমচৈতন্যের জাগরণের কথা সকল শাস্ত্রেই বলা হয়েছে। বেদান্তের মতে, ঈশ্বর হলেন সচ্চিদানন্দস্বরূপ ও পরমচৈতন্যময়। তাঁর শক্তিতেই এই জগৎ চলেছে এবং আমরাও নানাবিধ কাজকর্ম করছি। সবার অন্তরেই তাঁর অবস্থান; তবে সাধারণ অবস্থায় তাঁকে অনুভব বা উপলব্ধি করা যায় না। এর জন্যই প্রয়োজন হয় সাধন-ভজন, স্বাধ্যায়, সাধুসঙ্গ, নিদিধ্যাসন ইত্যাদি, তাবেই সেই চৈতন্যময় সত্তার অনুভূতি লাভ করা যায়। তন্ত্রমতেও মন্ত্রচৈতন্যের জাগরণ ব্যতীত মন্ত্রজপ করে কোনোই ফললাভ করা যায় না। পুনশ্চরণা ইত্যাদি নানা প্রক্রিয়ায় আগে মন্ত্রের চৈতন্য-সম্পাদন করে পরে যথাবিধি মন্ত্রজপ করতে হয়। তবেই ঈপ্সিত ফললাভ করা যায়। সুতরাং চৈতন্য বা চিৎশক্তি প্রসঙ্গে নতুন করে আর বলবার কিছুই নেই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই এই চৈতন্যের উদ্বোধনেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। যে ব্যক্তির হৃদয়ে সেই চৈতন্যের আলোকদীপ প্রজ্বলিত হয়েছে, যে ব্যক্তির হৃদয়কন্দর সেই পরম সত্তার মহিমময় আলোকজ্যোতিতে উদ্ভাসিত, সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ, তাঁর কখনই কোনো কিছুতেই ভ্রম ঘটে না। নিত্য-অনিত্য বস্তু সম্পর্কে তাঁরই প্রকৃত জ্ঞান-লাভ হয়েছে। সেই ব্যক্তিই পরমার্থ লাভের উত্তম অধিকারী। যে সকল ব্যক্তি কিছুটা হলেও কথামৃত পড়েছেন বা শুনেছেন, তারা তো এটা অতি অবশ্যই জানেন যে, ঠাকুর সংসার ও সংসারীদের বা বলা ভালো যে, গৃহস্থদের প্রসঙ্গে বারে বারেই বলেছেন। তিনি চাইতেন যে, গৃহীরা আদর্শ গৃহস্থ হয়ে উঠুক। তাই তিনি তাঁর কাছে আগত গৃহী ভক্তদের কেমনভাবে আদর্শ গৃহস্থ হতে হয়, সেই ব্যাপারে উপদেশ দিতেন। গার্হস্থ্যধর্ম একটা খুব বড়ো ব্যাপার। ধর্ম ও সমাজ রক্ষার ব্যাপারে সন্ন্যাসীদের যেমন ভূমিকা রয়েছে, তেমনই গৃহীদেরও রয়েছে অবশ্য পালনীয় কিছু ভূমিকা। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই যে, সেই ধর্মানুসারী ভূমিকা সাধারণ মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আদৌ কি পালন করতে পারছেন বা করছেন? ব্যাপারটা সত্যিই ভেবে দেখবার মতো, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত হওয়া তখনই সার্থক বা যথার্থ হবে যখন আমরা তাঁর উপদেশগুলি যথার্থ ভাবে মেনে চলব বা পালন করব, অন্যথায় নয়।

এক্ষেত্রে বলবার কথা এটাই যে, হিন্দুসমাজের একটা বড়ো অংশই আজ বিপথগামী। বৃহত্তর ক্ষেত্র বা পরিসর বাদ দিয়ে যদি আমরা এই রাজ্য অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুদের কথাই পর্যালোচনা করি, তবে এটাই দেখব যে, বহু ক্ষেত্রেই এই রাজ্যের হিন্দুসমাজ নিজেদের সনাতন ধর্মীয় আদর্শ, সংস্কৃতি, দেশপ্রেম, আত্মসম্মান— এক কথায় যথাসর্বস্বই বিসর্জন দিয়েছে বা ত্যাগ করেছে। তাই প্রকাশ্য সভায় নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণের কথা সদর্পে ঘোষণা করতে পারে কলকাতার জনপ্রিয় গায়ক, এখানকার অভিনেত্রী শিবলিঙ্গ কলুষিত করবার কথা বলে বেশ হাততালি পায় এবং অপদার্থ হিন্দুসমাজ তা নিয়ে বেশ মজা উপভোগ করে। এই কলকাতার এক জনপ্রিয় কবি, শিবের ত্রিশূল কলুষিত করবার কথা বলবার সাহস পায় আর জনগণ সেই কবিকে দেয় বাহবা। এটাই এখানকার পাশ্চাত্য ভাবনার অন্ধ অনুসারী হিন্দুসমাজের একটা বড়ো অংশের চিত্র। নিজস্ব ধর্ম, অধ্যাত্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষাদীক্ষা, রীতি-নীতি, ঐতিহ্য-পরম্পরাকে প্রতিনিয়ত এরা করে চলেছে আঘাত ও অপমান। তাই একথা বলা যেতেই পারে যে, এরা যেন সনাতন ধর্মকেই ধ্বংস করবার ব্রত গ্রহণ করেছে। লক্ষ্য করবার ব্যাপার এটাই যে, বর্তমান যুগের গণমাধ্যমগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সব হিন্দু ধর্মবিদ্বেষী, জেহাদিদের প্রশ্রয়দাতা (বা প্রশ্রয়দাত্রী) তথাকথিত বুদ্ধিজীবী (যারা আসলে ধান্দাজীবী) ব্যক্তিদের লালন-পালন করে থাকে। হিন্দু যুবসমাজের একটা খুব বড়ো অংশও আজ সনাতন ধর্মের সঙ্গে একেবারেই সম্পর্কহীন। এদের না আছে কিছুমাত্র হিন্দুধর্ম বা হিন্দুশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান, না আছে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা। তার প্রতিফলন এদের সামাজিক ব্যবহার, রাজনৈতিক মতামত, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, বিনোদন, রুচি বা পছন্দ— এককথায় সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। এই কারণেই বিকৃত রুচির চলচ্চিত্র, সংগীত, নৃত্য কিংবা সাহিত্য এবং কদর্য, নোংরা টিভি সিরিয়ালেও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে, নাটক লোকশিক্ষার এক মহান উপকরণ। তাই, তিনি নাটক ইত্যাদি করবার ক্ষেত্রে বারে বারে উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু বর্তমানে এটাই দেখা যাচ্ছে যে, সমস্ত নীতি-নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়েছে অধিকাংশ টিভি চ্যানেল ও তাদের ধারাবাহিকগুলি। সংসার গড়া তো দূরে থাকুক, গড়ে তোলা সংসারও একেবারে ভেঙে দেবে এরা আর এটাই এদের কাজ। তাই, সনাতন ধর্মের পক্ষে কিছু বলা হলেই উগ্রবাদী, হিন্দুত্ববাদী, নীতি-পুলিশ ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করা হয়।

যারা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবেদ যথার্থকরূপে অধ্যয়ন করেছেন, তারা একথা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে, তিনি আধ্যাত্মিকতা ও ঈশ্বরবোধকেই সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। তাঁর মতে মানুষের একমাত্র উদ্দেশ্যই হলো— ঈশ্বরলাভ। কথামৃতের প্রতি পৃষ্ঠায় রয়েছে তাঁর সেইসব অনবদ্য উক্তি তথা বাণী। এই যুগে দাঁড়িয়ে তাই এটাই বলবার যে, তাঁর প্রদর্শিত সেই পথ থেকে সাধারণ হিন্দুসমাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহু দূরে সরে এসেছে। ভাবুন তো, কটা হিন্দুগৃহে নিয়মিত ঈশ্বরের আরাধনা ইত্যাদি হয়। কিংবা নিয়মিত পুজোপাঠ ও প্রার্থনা, নিয়মিত তুলসীসেবা করা কিংবা হিন্দুধর্মগ্রন্থচর্চা বা অধ্যয়ন করা হয়? ১ জানুয়ারি, ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিন। এই দিনের আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় আনন্দ করবার নামে নির্লজ্জ বেলেল্লাপনা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও আদর্শহীনতার প্রকাশ। তাছাড়া বাঙ্গালির সুরাপ্রেম যে অনুপাতে বেড়ে চলেছে, তা তো কল্পনাতীত। ভারতীয় ঐতিহ্যকে ধূলিসাৎ করে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে চলবার মধ্যে কোনো মাহাত্ম্য নেই। এতে কদাপি চৈতন্যের জাগরণ ঘটা সম্ভব নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন তথা কল্পতরু দিবস উদ্‌যাপন একমাত্র তখনই যথার্থ হবে, যখন আমরা আধ্যাত্মিকতাকেই জীবনের ভিত্তি করে তার উপরে জীবন বা তার ইমারত গড়ে তুলবে। ভারতের তথা হিন্দুজাতির প্রাণকেন্দ্রই হলো ধর্ম। তাই মানুষ যত ধর্মচর্চা থেকে সরে আসবে, ততই তার বিনাশের সময় হবে ত্বরান্বিত। স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুজাতিকে বারে বারে এই ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। হিন্দু সমাজ সতর্ক হলেই কল্পতরুর চৈতণ্যের জাগরণ ঘটবে।

(লেখক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক)

পাঁচ দশক পর ঢাকার রমনা কালীমন্দিরের সংস্কার

আনন্দ দেবশর্মা

ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন মন্দির ঢাকার রমনা কালীমন্দির। এটি আজও রমনা কালীবাড়ি নামে পরিচিত। বিজয় দিবসের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে গত ১৫ ডিসেম্বর ঢাকা পৌঁছন ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। তিনদিনের সফরের শেষে ১৭ ডিসেম্বর সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন রমনা কালীমন্দিরে তিনি স্ত্রী, কন্যা ও ভারতের প্রতিনিধি-সহ মন্দিরে অসেন। তাঁদের অভ্যর্থনা জানান বাংলাদেশের কৃষিমন্ত্রী আবদুর রজ্জাক ও ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খান। মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর সংস্কার হওয়া অংশের উদ্বোধন করেন তিনি। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ গণহত্যার সময় কামান দেগে মন্দিরটি ধ্বংস করে পাকিস্তানি খানসেনারা।

ঢাকার সরকারি তথ্য অনুযায়ী নেপাল থেকে আসা মা কালীর কোনও ভক্ত মন্দিরটি নির্মাণ করেন, পরে ভাওয়ালের রানি বিলাসমণি দেবী এটির সংস্কার করেন। ১৮৫৯ সালে ঢাকার মানচিত্রে মন্দিরটি কৃপাসিন্ধুর আখড়া নামে আভিহিত করা হয়েছে। বর্তমানের সোহরাবর্দি উদ্যানের ভেতরে দিঘির পাশেই ছিল তিনশো বছর আগের এই মন্দির। লোককথায় জানা যায়, পাঁচশো বছর আগে বদ্রীনারায়ণের যোশীমঠের সন্ন্যাসী গোপাল গিরি প্রথম এখানে একটি আখড়া স্থাপন করেন। পরে সেখানেই হরিচরণ গিরি বাঙ্গালি হিন্দু স্থাপত্যরীতি অনুসারে মূল মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মূল মন্দির ছিল দ্বিতল। ছাদের উপর ছিল ১২০ ফট উঁচু পিরামিড আকৃতির চূড়া। প্রাচীর ঘেরা মন্দিরে একটি সদৃশ্য কাঠের সিংহাসনে স্থাপিত ছিল ভদ্রকালীর মূর্তি। এই মূর্তির ডানদিকে ভাওয়ালের কালীমূর্তি। মন্দিরের উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিমে ছিল পূজারি, সেবায়েত ও ভক্তদের থাকার ঘর। পাশে একটি শিবমন্দিরও ছিল। ছিল সিংহদরজা ও নাটমন্দির। কালীমন্দিরের উত্তর পাশে ছিল আনন্দময়ী আশ্রম। মা আনন্দময়ী ছিলেন সন্ন্যাসিনী। তিনি আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারিণী ছিলেন। তাঁর ভক্তরা রমনা ও সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়িতে দুটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭১ সালে খানসেনারা মন্দির ধ্বংসের পর আশ্রম দুটিও ধ্বংস করে। সেবায়েত-সহ সন্ন্যাসী, ভক্ত এবং সেখানে বসবাসরত সাধারণ মানুষদেরও হত্যা করা হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর নতুন ভাবে তৈরি হযেছে কালীমন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রম। মন্দিরের প্রধান ফটকের বাইরে রয়েছে ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ নিহতদের তালিকা সংবলিত স্মৃতিফলক। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সঙ্গে রমনা কালীমন্দিরের নামও জড়িয়ে আছে। ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ এবং মুক্তিযুদ্ধের পরে পরাজিত পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল রমনা রেসকোর্স ময়দানেই। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্বাধীন বাংলাদেশ সফরে এসে এই স্থানে মুজিব-ইন্দিরা মঞ্চে বাংলাদেশের মানুষের উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর বঙ্গবন্ধু ছুটে এসেছিলেন রমনা রেসকোর্স ময়দানেই।১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও কোনও সরকার রমনা কালীমন্দির পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ নেয়নি। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর কালীমন্দিরের জন্য ২.২৬ একর জমি দান করেন। সেই জমিতেই ভারত সরকারের অনুদানের ৭ কোটি টাকায় ভক্তনিবাসের পুনর্নির্মাণ ও মূল মন্দিরের সংস্কার করা হলো। □

কালীদাসের মৃত্যুরহস্য

ড. অশোক দাস

রানিমা বরাহ ও বারুইরাজ পণ্ডিতকে বললেন—তোমরা দুজনেই অপরাধ করেছ। বারুইরাজকে বললেন---মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, ছেলের বাবা-মায়ের অনুমোদন নিয়েছেন? মঠ-মন্দিরে মেয়ের কপালে সিঁদুর পরিয়ে দিলেই বিবাহ হয়ে যায়? বরাহ পণ্ডিতকে বললেন—নিজের জীবন্ত পুত্রকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছ, রাজসভায় মিথ্যা কথা বলেছ, তোমার কোনও পুত্র সন্তান নাই। দত্তক পুত্র গ্রহণ করে তাকে কি মানুষ করতে পেরেছ? একটি অমানুষ তৈরি করেছ। আজ দেশে দেশে তোমরা কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণকর কাজ করে যাচ্ছ। সভা নিস্তব্ধ। রানিমা পণ্ডিত কালিদাসকে জিজ্ঞেস করলেন এই পণ্ডিতদের কী শাস্তি হওয়া উচিত? কালিদাস বললেন—এই সভায় দাঁড়িয়ে আগে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুক। রানিমার কাছে পণ্ডিত বরাহ ও বারুইরাজ ক্ষমা প্রার্থনা করায়, রানিমা বললেন—খনা ও মিহিরের বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হয়নি। রাজবাড়ির দুই কুলপুরোহিত দামোদর ও ভৃগু জ্যোতির্মানবকে ডেকে বললেন— আগামীদিন গোধূলি লগ্নে খনা ও মিহিরের বিবাহের ব্যবস্থা করুন। যেন কোনও ত্রুটি না হয়। বারুইরাজকে বললেন—খনা আমারই মেয়ে। এই অনুষ্ঠানে খনাকে আমি সম্প্রদান করব। বিদ্যাবতীকে বললেন--- খনাকে রাজপুরীর অন্দরমহলে নিয়ে গিয়ে যা যা প্রয়োজন তা দিয়ে সাজিয়ে তোল। এইভাবে বিদ্যাবতীর সঙ্গে খনার সুমধুর প্রীতির সম্পর্কটি গড়ে উঠে। বরাহ পণ্ডিত ও সহধর্মিণী ধারদেবীকে বললেন, পুত্র ও পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করে বাড়ি নিয়ে যান। এই ভাবে মহানন্দে বিপুল উৎসাহে কুমার গুপ্তের বার্ষিক অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটল।

মহারাজ কুমারগুপ্তের নির্দেশে খনা ও মিহিরের রাজকার্যের দায়িত্বভার পড়ল পণ্ডিত কালিদাসের উপর। এই রাজসভাতে দুই জনের একই নাম হওয়ায় পণ্ডিতরা বরাহের পুত্রকে বরাহ দত্তক মিহির এবং দত্তক পুত্রকে মিহির বলে ডাকতেন। খনা ও মিহির ভারতবর্ষের রাজ্যগুলি পরিভ্রমণ করতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন অসংখ্য মানুষ দুঃখে কষ্টে জীবনযাপন করছে। কেবল উচ্চবর্ণের মানুষরাই সুখে শান্তিতে ধনদৌলতে বিলাসিতায় কালাতিপাত করছে।

খনা ও মিহির পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে জানতে চাইলেন— এক সময় ভারতবর্ষে নারীরা শিক্ষিত হওয়ায় দেশের উন্নতি সাধন সম্ভব হয়েছিল, বর্তমান নারীরা শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত হলে সুস্থ ও সবল সমাজ কীভাবে গড়ে উঠবে? পণ্ডিত মহাশয় বললেন—বরাহ পণ্ডিত ছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ কৃতী ছাত্র ও অধ্যাপক। তাই মহারাজ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্বভারটি দিয়েছিলেন বরাহ পণ্ডিতের উপর। একদিন খনা ও মিহির মহারাজ কুমার গুপ্তকে বললেন—দেশের অসংখ্য কৃষক, জেলে, তাঁতি, কুমোর, কামার প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ অত্যন্ত দুঃখে কষ্টে জীবন যাপন করছে। কোল-ভীল-নাগা-মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি জনজাতি শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত। রাজার কর্তব্য সমস্ত শ্রেণীর মানুষের উন্নতি সাধন, তা নাহলে একদিন রাজসিংহাসনের মর্যাদা ধুলায় লুণ্ঠিত হবে। মহারাজ বললেন---আজ থেকে রাজ্যের শিক্ষার ভার তোমাদের উপর অর্পণ করলাম।

মানুষ ভাবে এক, পরিবেশ পরিস্থিতি অনুসারে হয় আর এক! মহিয়সী সীতাদেবী যেমন ঋষির আলয়ে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত কিন্তু সংসার জীবনে চিরদুঃখিনী। ঠিক তেমনি ঘটল খনা ও মিহিরের ক্ষেত্রে। অসংখ্য মানুষ খনা ও মিহিরের কাছে আসতেন দুর্ভাগ্যের হাত থেকে উপায় খুঁজতে। বরাহ পণ্ডিতের ভৃগু, লোমশম, পরাশর প্রভৃতি মুনি ঋষিদের জটিল তথ্য বিচার বিশ্লেষণ করে উঠতে দুই, চার ছয় দিন থেকে পক্ষকাল সময় লাগত। খনা ও মিহির সেগুলি মুহূর্তের মধ্যে সঠিক সমাধান করে দিতেন। বরাহ পণ্ডিত যে সমস্ত প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেন তা কেবল ধনবান ব্যক্তি ছাড়া গরিব মানুষের সাধ্যের বাইরে। ধীরে ধীরে বরাহ পণ্ডিতের মানমর্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত হতে থাকল। দত্তকপুত্র মিহির হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকায় খনা ও মিহিরকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার গোপন চক্রান্ত করতে লাগলেন। খনাদেবী ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। দত্তক মিহিরের ছল-চাতুরী বুঝতে পেরে একদিন রানিমার কাছে অনুরোধ জানালেন—রাজকীয় আচার আচরণে আমার সাধনভজন বিঘ্নিত হচ্ছে। যদি পণ্ডিত মহাশয়ের অনুরূপ গঙ্গাতীরে পর্ণকুটিরের

ব্যবস্থা করে দেন আমরা ধন্য হব। মহারানির নির্দেশে খনা ও মিহিরের পচ্ছন্দ অনুসারে পণ্ডিত মহাশয়ের কালীমন্দিরের পাশে অপূর্ব সুন্দর কারুকার্য খচিত রাধাকৃষ্ণের মন্দির ও বাসস্থান নির্মিত হল। পণ্ডিত মহাশয়ের মতো খনা ও মিহিরও রাজবাড়ি থেকে কোনও পারিতোষিক গ্রহণ করতেন না। অনুরূপ উজ্জয়িনীতে পণ্ডিত মহাশয়ের বাসস্থানের পার্শ্বে খনা ও মিহিরের মন্দির ও বাসস্থান নির্মিত হলো। সমাজে ঘৃণিত লাঞ্ছিত মানুষজন যখন খনা ও মিহিরের কাছে আসত, সকলের কথাগুলি মন দিয়ে শুনতেন, পরম সমাদরে সুমধুর ব্যবহারে সকলের হৃদয় মন মহা আনন্দে ভরে উঠত। সকলেই তাদের কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ নিজ কাজ কর্মে মনোনিবেশ করতেন। ধীরে ধীরে আরম্ভ হলো সমস্ত শ্রেণীর মানুষের সুশিক্ষা। গৃহে গৃহে ছড়িয়ে পড়ল ছড়া ও গানের মধ্যে খনার বচন। সকলেই সেগুলি বেদবাক্যের মতো পালন করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে সমস্ত শ্রেণীর মানুষের বিকাশ লাভ ঘটতে থাকল।

একদিন কুমারগুপ্তের রাজসভায় শ্রীলঙ্কার মহারাজ কুমার দাসের দূত এসে আমন্ত্রণ জানালেন—তাঁর পিতৃদেবের রাজ্যাভিষেকের পঞ্চাশ বছর পুর্তি উপলক্ষ্যে এক আনন্দ উৎসবের অনুষ্ঠান করেছেন। বিশেষত এক পক্ষকাল আগে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন কালিদাস ও খনা-মিহিরকে। কারণ তিনি একটি নাটক লিখেছেন 'জানকীহরণ'। এই নাটকটি পরিচালনার দায়িত্বে থাকছেন কালিদাস। অপূর্ব নৃত্য ও সংগীতশিল্পী ছিলেন খনা। এই নাটকটির নৃত্যগীত শিল্পীদের দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে খনাদেবীর উপর। এই আমন্ত্রণে মহারাজ কুমারগুপ্ত সাদরে গ্রহণ করায়, যথাসময়ে রাজ্যের জ্ঞানীগুণী শতাধিক পণ্ডিত ব্যক্তি গিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কায়। অপূর্ব মনোরম পরিবেশ শ্রীলঙ্কায় বারুই রাজের আশ্রম। অনতিদূরে রাবণের রাজপ্রসাদ। কুমার দাস সমস্ত রকম সুব্যবস্থা রেখেছিলেন আমন্ত্রিতদের। বারুইরাজের বিশেষ অনুরোধে খনা মিহির, দত্তক মিহির ও তার সহধর্মিণী লতিকা থাকতেন বারুইরাজের গৃহাশ্রমে। এখানে মাঝে মাঝে থাকতেন কালিদাস। কুমার দাসের 'জানকীহরণ' নাটকটির মার্জিত রূপদান করেন মহাকবি কালিদাস। এই নাটকটির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাবণের ভূমিকায় কুমার দাস, বিভীষণের ভূমিকায় পণ্ডিত কালিদাস, সীতা ও রামচন্দ্রের ভূমিকায় খনা ও মিহির। এই সময় মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিমেল ঝড়ো হাওয়ায় মহাকবি শ্লেষ্মা, কফ, কাশিতে ভুগতেন। শরীর স্বাস্থ্যের প্রতি তিনি ছিলেন উদাসীন। খনাদেবীর সেবা যত্নে সুস্থ হয়ে উঠলেন পণ্ডিত মশায়। খনাদেবী খলনুঁড়িতে পদ্মবীজ গুঁড়ো করে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে কৌটায় রাখতেন, তা আড়াল থেকে লক্ষ্য করতেন লতিকা। মাঝে মাঝে গানের গলা পরিষ্কার রাখার জন্য খনা ও মিহির তা সেবন করতেন। অনুষ্ঠানের শেষ দিন বিশাল সমারোহে 'জানকীহরণ' নাটকটি অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। বারুইরাজের আশ্রম থেকে সকলেই গিয়েছেন নাটকটি দেখার জন্য। দত্তক মিহির ও লতিকা অসুস্থতার ভান করে থেকে যান আশ্রমে। গভীর রাত্রিতে দত্তক মিহিরকে লতিকা বলল—এই তো সুবর্ণ সুযোগ, চলে এস দেখবে। খনা দেবী কোথায় কীভাবে ওষুধ তৈরি করে, কোথায় রাখে সবই দেখেছি। আমি লতাপাতার গুণ, টোটকা, মন্ত্র তন্ত্রে সিদ্ধ হস্ত। ওরা কিছুই বুঝতে পারবে না বিষাক্ত বীজ গুঁড়ো করে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে দিলে। ওষুধের কৌটা থেকে সব ফেলে দিয়ে বিষাক্ত বীজের গুঁড়ো সেখানে রেখে মন্ত্রতন্ত্র জপ করে বললেন—খনা ও মিহিরের মৃত্যু অনিবার্য। উৎসবের শেষ দিন নাটকটি অনুষ্ঠিত হলো। আহারাদির পরে পণ্ডিত মশায় খনা দেবীকে বললেন—আগামীদিন যাত্রা করব ভারতবর্ষে। চল, রাবণের প্রমোদকানন, সীতাদেবীর বন্দিশালাটি দেখে আসি। পথে যেতে যেতে মাঝে মাঝে কাশির উদ্রেক হচ্ছে দেখে খনাদেবী কৌটো থেকে ওষুধটি খাইয়ে দেওয়ায় পণ্ডিত মশায় বললেন—খনা! তুমি আমাকে কী খাওয়ালে, এ তো ওষুধ নয়! এ তো বিষ! এই কাণ্ডটি যে দত্তক মিহিরের কাজ তা বুঝতে পারলেন খনা ও পণ্ডিত মশায়। কিছুক্ষণ পরে খনা ও মিহির পণ্ডিত মশায়কে নিয়ে পৌঁছিয়ে গেলেন অশোক কাননে। অশোক কাননে দাস দাসীরা অপেক্ষা করছিলেন পণ্ডিত মশায়ের জন্য। খনা ও মিহির দাস দাসীদের উপর পণ্ডিত মশায়ের দায়িত্ব দিয়ে রাজপুরীতে দৌড়ে গেলেন বৈদ্য ডেকে আনার জন্য। মহারাজ কুমার গুপ্তের নিযুক্ত দাস দাসীদের জন্য পারিতোষিক পাঠিয়েছিলেন। প্রত্যেককে দশটি করে স্বর্ণমুদ্রা দেওয়ায় সকলেই পণ্ডিত মশায়কে দেবতার মতো শ্রদ্ধা ভক্তি জানাল। মহাকবি বললেন—একটু পরেই আমি পরলোক গমন করব। আমার দেহ নদীতে ভেসে না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা আমাকে স্পর্শ করবে না। পরে দেবমন্দিরে প্রবেশ করে সীতাদেবীর শ্রীচরণে প্রার্থনা জানিয়ে পাশে একটি নদীতে এককোমর জলে দাঁড়িয়ে বেদমন্ত্র জপ করতে করতে যোগবলে প্রাণত্যাগ করেন। দাস দাসীরা দেখলেন পণ্ডিত মহাশয়ের শরীর থেকে—যেন একটি আলোর জ্যোতি বেরিয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল। যখন নদীতে দেহটি ভাসতে থাকল দাস দাসীরা দেহটি তুলে শায়িত রাখায় রাজবৈদ্য ধন্বন্তরী পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানালেন— পণ্ডিত মশায় আর ইহজগতে নেই। অসংখ্য মানুষের অশ্রুধারায় পণ্ডিত মহাশয়ের দেহ ঘৃত চন্দন কাষ্ঠে রাবণের চিতায় ভস্মীভূত হলো।

খনা, মিহির ও পণ্ডিতরা ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। ভারতবর্ষে নেমে এল শোকের ছায়। খনাদেবী বরাহ পণ্ডিতের পা দুটি জড়িয়ে বললেন---আপনি কি ধৃতরাষ্ট্রের মতো একেবারেই স্নেহান্ধ? একবার তাকিয়ে দেখুন এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টিকর্তার সুনিদৃষ্ট নিয়ম শৃঙ্খলে চলছে। পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সকলেই সেই নিয়ম শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তবে আপনার জীবনে এত বিশৃঙ্খলা কেন? আপনার দত্তক পুত্র মিহিরের হীন উদ্দেশ্য ও অধঃপতন আপনার দৃষ্টিগোচরে আসা সত্ত্বেও কেন এর প্রতিকার করেননি? আপনার অভিশাপ এবং দত্তক পুত্র মিহিরের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে। এবার আপনি বলুন— রাজসভায় যখন আমাকে জিজ্ঞেস করবে—পণ্ডিত মশায় কীভাবে দেহত্যাগ করলেন, যখন বিদ্যাবতী জানতে চাইবে আমার স্বামী শ্রীলঙ্কা থেকে ফিরে এল না কেন? আমি তখন কী উত্তর দেবো? এই বলে খনাদেবী দেবমন্দিরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। দেবমন্দিরের দরজা ভাঙার পর দেখলেন--- খনাদেবী ধারালো অস্ত্র দিয়ে জিহ্বাছেদন করে আত্মহত্যা করেছেন। রক্তের ধারায় দেবমন্দির ভেসে যাচ্ছে। এইভাবে আমরা জ্ঞানী পণ্ডিত কালিদাসকে ও জ্যোতির্বিদ খনাদেবীকে চিরতরে হারালাম। *(শেষ)*

হারিয়ে যাওয়া এক স্বাধীনতা সংগ্রামীর খোঁজে

কৌশিক রায়

ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন, বুলেট ও ফাঁসির দড়িতে অকালে অমূল্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন অগণিত মুক্তিযোদ্ধা। 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে' হাসিমুখে প্রাণবলিদান করা সেই অজস্র বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা এই ভারতভূমিতে অনেকেরই নাম ও পরিচয় অজ্ঞাত। অগ্নিযুগের সেই অনামা সৈনিকদের মধ্যে একজনের নাম অবশ্যই স্মর্তব্য। বিহারের সারান জেলার ভোজপুরী ভাষাভাষী এবং সন্ত কবীর, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, কবি যাগ, সুরেশকুমার মিশ্র, ভগবতী প্রসাদ দ্বিবেদী, রবীন্দ্র ভারতী ও জোহার সাফিয়াবাদির সাহিত্য প্রতিভা বিধৌত বাসভূমির স্মৃতি নিয়ে এই দেশের অন্যতম দেশপ্রেমিক কবি, বিপ্লবী ও সংগীতজ্ঞ ১৮৮৬ সালে জাত মহেন্দর মিশির ছিলেন যথার্থ অর্থেই একজন নবজাগরণ মনীষা বা 'রেনেসাঁ মানব'। পণ্ডিত মানুষদের স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তব করাতে অনুপ্রাণিত করা এই মহেন্দর মিশিরের কাব্যপ্রতিভাকে অনায়াসে তামিল মহাকবি সুব্রহ্মণ্যম্ ভারতী, চারণকবি মুকুন্দ দাস ও রজনীকান্ত সেনের কাব্যপ্রতিভার সঙ্গে তুলনা করা যায়।

একাধারে সাহিত্যসেবী ও ক্রীড়ামোদী মহেন্দর মিশিরের কর্মময় জীবন সম্পর্কে সবচেয়ে ভালোভাবে আলোকপাত করেছেন পাণ্ডে কপিল তাঁর ভোজপুরী ভাষাতে রচিত 'ফুলুসংগি' উপন্যাসটিতে। উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন গৌতম চৌবে। ১৮৮৬ সালে সারান জেলার অন্তর্গত মিশ্রডিলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন মহেন্দর মিশির। প্রথাগত বিদ্যালয় শিক্ষায় বিশ্বাস না করে গল্পচ্ছলে ও বিশ্বজ্ঞানের সাহায্যে শিক্ষাদানেই বেশি মাত্রায় আগ্রহী ছিলেন তিনি। কথকতা (প্রবচন), লোকনাট্য ও লোকসংগীতেও পারঙ্গম ছিলেন মহেন্দার।

ছেলেবেলা থেকেই মহেন্দর মিশির লক্ষ্য করেন ইংরেজদের পোষ্য, লোভাতুর জমিদারদের দ্বারা নিপীড়িত হয়ে কত সম্পন্ন কৃষক, হতদরিদ্র হয়ে দেশান্তরী হয়েছেন অথবা ভূমিদাসে (গিরমিটিয়া) পর্যবসিত হয়েছেন। বিহারের চম্পারণ থেকে অত্যাচারিত নীলচাষিদের হয়ে মহাত্মা গান্ধী অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছিলেন বটে, তবে গান্ধীজীর অহিংসমূলক 'পরোক্ষ প্রতিরোধ' (Passive Resistance)-কে ততটা সমর্থন করতে পারেননি মহেন্দর মিশির। সশস্ত্র প্রতিরোধের মাধ্যমেই ব্রিটিশ সরকারের ভিত্তি কাঁপিয়ে দেওয়া যায় বলে মনে করতেন তিনি। এরজন্য উত্তর প্রদেশের চৌরীচৌরাতে সত্যাগ্রহীদের দ্বারা ২০ জন পুলিশ কর্মীকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করার ব্যাপারে গান্ধীজী মহেন্দর মিশিরের জ্বালাময়ী বক্তৃতা ও গানকেও কিছুটা দায়ী করেছিলেন। মহেন্দর মিশিরকে ইংরেজবিরোধী সংগ্রামে সাহায্য করেন আর এক ভোজপুরী সংগীতকার—রঘুবীর নারায়ণ ও ছাপড়া জেলার মানবহিতৈষী জমিদার— হালিবন্ত সহায়। বারাণসীতে মহেন্দর মিশিরের দেশাত্মবোধক গান শুনে অনুপ্রাণিত হয়ে ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হন সেখানকার দেহোপজিবিনীরাও। লক্ষ্ণৌ, জৌনপুর, পাটনা ও মজফ্ফরপুরেও বহু মানুষ, মহেন্দর মিশিরের দেশপ্রেমের সংগীত ও বক্তৃতার দ্বারা উদ্বেলিত হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী

আন্দোলন গড়ে তোলেন। সোনপুর পশুমেলাতে গান ও কবিতা সম্মেলনের মাধ্যমে ইংরেজ বিরোধী জনমত গড়ে তোলেন মহেন্দর মিশির। কলকাতাতেও ছড়িয়ে পড়ে মহেন্দরের জনপ্রিয়তা। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে মহেন্দর মিশিরও কিছুটা জড়িতে ছিলেন। বিহারের ভাগলপুরে, বঞ্চিত সমাজ এবং নির্যাতিতা নারীজাতির আর এক সাহিত্য চিত্রকর, কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও পরিচয় হয় মহেন্দরের। ব্রিটিশ সরকার যে ভারতের সম্পদকে লুণ্ঠন করে টেমস নদী ও ইংলিশ চ্যানেলের তীরে পাঠাচ্ছে সেটা সম্বন্ধে দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন মহেন্দর মিশির। ১৯০৭ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থা শুরু হলে লোকমান্য তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, লালা লাজপত রায়ের বৈপ্লবিক আদর্শের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠেন মহেন্দর মিশির। বিহারের ওয়াইনি রেলস্টেশনে প্রফুল্ল চাকী ব্রিটিশ পোষ্য দেশি দারোগার হাতে দরা পড়ার লজ্জা এড়াতে নিজের পিস্তলের গুলিতে আত্মঘাতী হন। মজফ্ফরপুর স্টেশনে ধৃত ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি হয়। এই দুটি ঘটনা প্রবলভাবে নাড়া দেয় মহেন্দর মিশিরকে। ম্যাৎসিনি-গারিবাল্ডির জীবনী পড়ে আরও বেশি করে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতি আকৃষ্ট হন তিনি। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে ভ্রাম্যমাণ গায়ক সেজে বিপ্লবীদের আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ আর ব্রিটিশ প্রশাসকদের সম্পর্কে গোপন খবর দেওয়া নেওয়া শুরু করে দেন মহেন্দরের। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বিবৃত স্বামী সত্যানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ, শান্তি ও মহেন্দ্ররের জ্বালামুখী চরিত্র এবং সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, মহেন্দরের দেশহিতৈষী অন্তঃকরণে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। এমনকী, কলকাতায় গোপনে জাল টাকা তৈরি করে সেগুলি অনুশীলন সমিতি আর যুগান্তর পার্টির মতো গোপন বিপ্লবী সংস্থাকে বিলিও করেছিলেন মহেন্দর। ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে এটা ছিল তাঁর প্রচণ্ড আঘাত। বিহারের তিরহুত এবং সারান অঞ্চলে 'সর্দার ভগৎ সিংহের হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের মতাদর্শ ও প্রচার পুস্তিকাকে ছড়িয়ে দিতেও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন মহেন্দর মিশির। গণ্ডক নদীতীরের গ্রাম জালালপুরের দুই বিপ্লবী ও ভগৎ সিংহ অনুগামী—যোগেন্দ্র শুক্লা এবং তাঁর ভাইপো বৈকুণ্ঠ শুকুলেরও বন্ধু ছিলেন মহেন্দর মিশির। ভগৎ সিংহের বিরুদ্ধে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলাতে রাজসাক্ষী হওয়া বেতিয়ার ফণি ঘোষকে দেশদ্রোহিতার জন্য প্রকাশ্যে ভোজালি দিয়ে কুপিয়ে খুন করেন বৈকুণ্ঠ। এর ফলে ফাঁসি হয় বৈকুণ্ঠর।

ক্রমশই ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা বাহিনীর নজরদারিতে পড়তে শুরু করেন মহেন্দর মিশির। গোপীচাঁদ ছদ্মনামে গৃহভৃত্য সেজে এক দেশি পুলিশ অফিসার জটাধারী প্রসাদ, মহেন্দর মিশিরের ওপর নজর রাখতে শুরু করে। পুলিশের হানাদারিতে, মহেন্দরের বাড়ি থেকে জাল নোট ছাপার যন্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। গ্রেপ্তার হলেন মহেন্দর আর তাঁর ভাই। বিচারে ২০ বছরের কারাবাস হলো তাঁর। মহেন্দর এর পক্ষে সওয়াল করতে এগিয়ে এলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস আর বৈপ্লবিক জাতীয়তাবোধের সমর্থক হেমচন্দ্র মিশ্র। তাঁদের চেষ্ঠাতে মহেন্দরের সাজার মেয়াদ কমে গিয়ে ১০ বছর হয়। তাঁকে আর্থিক সাহায্য দিতে রুপোর মোহর ও গয়না দিয়েছিলেন দেলাবাঈ, গওনুর জান, বিদ্যাধরী বাঈয়ের মতো ভগ্নীসমা নর্তকী বা 'তাওয়ায়েফ'-রা। বক্সার জেলে পাঠানো হয়েছিল মহেন্দর মিশিরকে। কারাবাসের সময়ে মহেন্দরের কাছে এসে অনুতাপ প্রকাশ করেছিলো জটাধারী প্রসাদ। সে বুঝতে পেরেছিল মহেন্দরের মতো দেশপ্রেমিকের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করে সে দেশমাতৃকারই অবমাননা করেছে। ১৯৩১ সালে কারাগার থেকে বেরোনোর আগে মহেন্দর মিশির শেষ করেছিলেন সাত খণ্ডে ভোজপুরী মহাকাব্য—'অপূর্ব রামায়ণ'। 'নিস্তন' নামের একটি দার্শনিক গীতিগুচ্ছও তিনি রচনা করেন। রাগ ভৈরবী এবং রাগ বেহাগে শাস্ত্রীয় সংগীত গাইতেও মহেন্দর মিশির ছিলেন সুদক্ষ। বর্তমানে ফিজি, মরিশাস, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, মায়ানমার, সুরিনাম, ব্রিটিশ গায়নার বাসিন্দা, ভোজপুরী ভাষী ভারতীয়দের মধ্যে স্বাধীনতার এই কবি কোকিলের ৭৫ তম তিরোধান দিবস পালন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবুও, মাতৃভূমি ভারতবর্ষেই এখনও অনেকটাই অজানা মহেন্দর মিশির।

সাহিত্যের বিবিধ প্রকরণে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন মহেন্দর মিশির। ঠুংরি, দাদরা, কাজরি, বারাহমাসার মতো ধ্রুপদী সংগীত ঘরানাতে তিনি গিরিজাদেবী, রশিদ খান, শোভা স্তর্তু, নাসির আমিনুদ্দিন জাগর, বড়ে গুলাম আলি খান, পণ্ডিত ভীমসেন যোশী, আমীর খানের যোগ্য পূর্বসূরী ছিলেন। দেশের দুরবস্থা দেখে মহেন্দর লিখেছিলেন—'আঠি আঠি রাতিয়া কুহুকে কোয়েলিয়া / রাম বারানিয়া ভেইলে না / মোরা আঁখিয়া কে নিনিয়া' (অর্ধরাত এখন, কোকিলের সুর শুনি / চোখে আমার অশ্রুবন্যা)। ভোজপুরী ছাড়াও আওয়াঠী, হিন্দি ও উর্দু ভাষাতে দেশাত্মবোধক গান ও কবিতা রচনা করেন মহেন্দর মিশির। তাঁর 'প্ররবীয়া গায়কী' ছন্দে তুলসীদাস ও কবীরের লেখনরীতির আভাস পাওয়া যায়। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে এক আনকোরা মানিক ছিলেন তিনি।

জেনারেল বিপিন রাওয়াতের দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত দেশের নিরাপত্তা ও অস্তিত্বের প্রশ্ন

জেনারেল বিপিন রাওয়াত এখন 'ইতিহাস'। কিন্তু দেশবাসীর দাবি, রহস্যাবৃত এই দুর্ঘটনার সত্য উদ্‌ঘাটিত হোক। কারণ এই দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশের নিরাপত্তা তথা অস্তিত্বের প্রশ্ন।

ধীরেন দেবনাথ

ভারতের সামরিক ক্ষেত্রে ঘটে গেল সর্বকালের এক বিশাল ক্ষতি। ৮ ডিসেম্বর এক মর্মন্তুদ হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ভারতের প্রথম সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক (তিন বাহিনীর প্রধান বা চিফ্ অব্ ডিফেন্স স্টাফ্) জেনারেল বিপিন রাওয়াত, তাঁর স্ত্রী মধুলিকা ও আরও ১২ জন সেনা অফিসার।

ওইদিন দুপুরের দিকে কোয়েম্বাটুরের সুলুর এয়ার ফোর্স ঘাঁটি থেকে আসা কপ্টারটি তামিলনাড়ুর কুন্নুরের ৭ কিলোমিটার দূরে নীলগিরি পর্বতের দুর্গম ঘন জঙ্গল ভরা চা বাগানে হঠাৎ সশব্দে জলন্ত অবস্থায় ভেঙে পড়ে। আর তাতেই মৃত্যু ঘটে ১৩ জনের। তাঁরা সবাই যাচ্ছিলেন ওয়েলিংটনে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় জেনারেল রাওয়াতকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি।

এদিকে দুর্ঘটনা ঘটার পরপরই নানা মহলে বিশেষত রাজনৈতিক মহলে উঠেছে নানা প্রশ্ন। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কারণ ঘটনাটির সঙ্গে দেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। তাছাড়া এহেন অভাবনীয় ঘটনা এদেশে ইতিপূর্বে ঘটেনি। তাই দেশবাসীও যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। বিস্মিতও বটে। বিস্ময়, উদ্বেগের কারণও রয়েছে। কেননা ভারতকে ঘিরে রয়েছে চীন ও পাকিস্তানের মতো চির

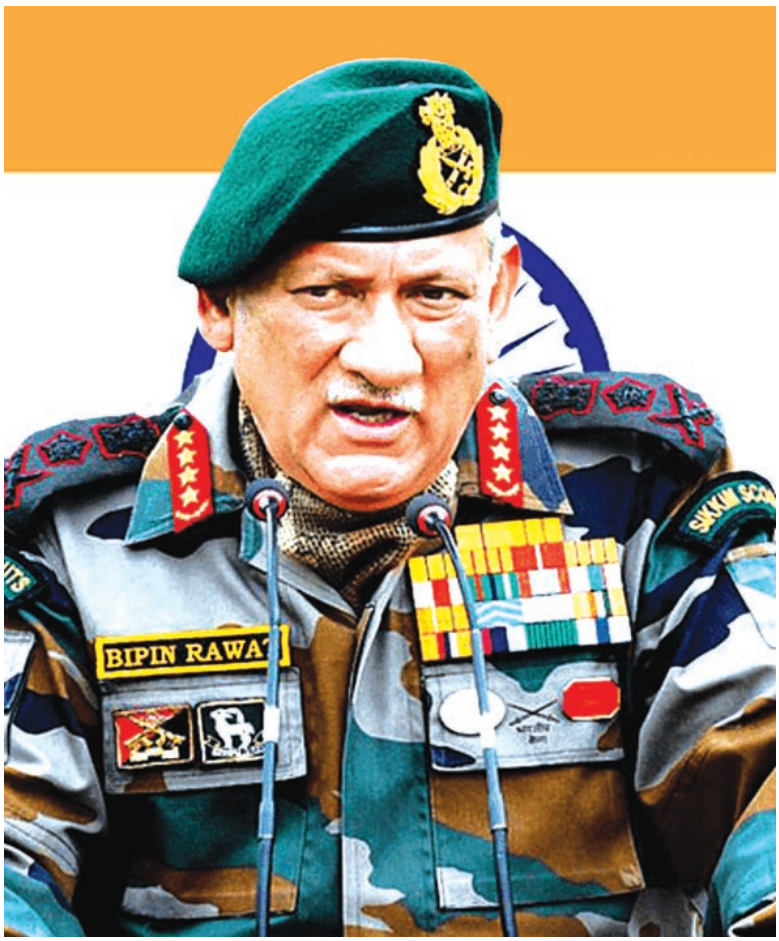

শত্রু দেশগুলি। তাদের মতিগতি ভালো নয়। তারা যৌথভাবে ভারতের সর্বনাশ করতে বদ্ধপরিকর। পাকিস্তান তো জন্মলগ্ন থেকে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছে। আর সাম্রাজ্যবাদী, একনায়কতান্ত্রিক ও মাওবাদী কমিউনিস্ট চীন ১৯৬২ সালে ভারত আক্রমণ করে কয়েক হাজার বর্গকিলোমিটার ভারতীয় ভূখণ্ড দখল করে নিয়েছে 'হিন্দি-চীনি ভাই ভাই'-এর প্রবক্তা পণ্ডিত নেহরুর অবিমৃশ্যকারিতার সুযোগ

নিয়ে। চীনের বর্তমান স্বৈরাচারী শাসক ভারতের চতুর্দিকের বহু দেশকে ঋণের জালে জর্জরিত করে এবং সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে ভারত দখলের পরিকল্পনা করছে। আর চিরশত্রু পাকিস্তান তার জন্মলগ্ন থেকেই ভারতের বিরুদ্ধে চালিয়ে আসছে সশস্ত্র ইসলামিক যুদ্ধ। ১৯৪৮ সাল থেকে সে আজও কাশ্মীর দখলে চালিয়ে যাচ্ছে অঘোষিত জেহাদ। এছাড়াও ভারতের অভ্যন্তরে রয়েছে চীন ও পাকিস্তানপন্থী দেশদ্রোহী জেহাদি জঙ্গিরা। তারা মাঝেমধ্যেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘটাচ্ছে অন্তর্ঘাত ও সাম্প্রদায়িক হানাহানি। আর তাতে ইন্ধন জোগাচ্ছে একশ্রেণীর রাজনৈতিক দল ও জেহাদি সংগঠন। শোনা যায়, দুর্ঘটনা ঘটার খবর জানাজানি হতেই বিশেষ এলাকায় খুশির বন্যা বয়ে যায়। চলে মিষ্টি বিতরণ। পশু জবাই। জেনারেল রাওয়াতের মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করেছে জাওয়াদ খান নামে এক দেশদ্রোহী যুবক। রাজস্থানের ওই নরাধম তার সামাজিক মাধ্যমে লিখেছে 'জাহান্নামে যাওয়ার আগে তাঁকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। এভাবেই আল্লার অভিশাপ নেমে আসে।' জাওয়াদ একা নয়, তার মতো বহু ভারত বিরোধীর ওই একই কথা।

মনের কথা। আর বলবে নাই-বা কেন? সামান্য ক্রিকেট খেলায় ভারত পাকিস্তানের কাছে হেরে গেলে যারা রাস্তায় নেমে আনন্দে মেতে ওঠে, মিষ্টি বিতরণ করে, আল্লাহু আকবর ধ্বনি তোলে, কোলাকুলি করে— আবার উল্টোটা হলে দাঙ্গা বাঁধায়, ভাঙচুর চালায় অগ্নিসংযোগ করে। তাদের কাছ থেকে আর কী আশা করা যায়। দেশদ্রোহীর ঘরে তো দেশদ্রোহীই জন্মায়। আর আমরা যারা দেশভক্ত তারা এই মিরজাফরদের সঙ্গে বাস করছি। এরাই আবার একশ্রেণীর ভোটভিখারি, ক্ষমতালোভী ও দেশদ্রোহী রাজনৈতিক দলের সম্পদ। এ যেন ক্ষমতা দখলের 'মিউজিক্যাল চেয়ার'-এর খেলা চলছে। তাই প্রশ্ন একটাই, ভারতের ভবিষ্যৎ কোন্ জাহান্নামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে? দেশপ্রেমিক মানুষের সংখ্যা কি ক্রমে কমে যাচ্ছে? তা না হলে এমন একটা রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের পর সেনাকর্তাদের মৃত্যু নিয়ে একশ্রেণীর রাজনীতিক রাজনীতি করে? কেন্দ্র সরকারকে অপরাধীর কাঠগড়ায় তোলে? যেন 'যত দোষ নন্দ ঘোষ' মোদী সরকার।

এমতাবস্থায় বীর জওয়ানদের মৃত্যু নিয়ে উঠেছে কিছু প্রশ্নও, যে প্রশ্নগুলি এড়িয়ে যাওয়া যায় না। যেমন—

(১) সেনা আধিকারিকদের মৃত্যুর কারণ কি নিছক দুর্ঘটনা, না কি ঘটানো হয়েছে? অর্থাৎ, তাঁরা কি অন্তর্ঘাতের শিকার?

(২) উড়ানের পূর্বে কপ্টারটির পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঠিকঠাক হয়েছে তো?

(৩) তিন বাহিনীর প্রধান হওয়াটাই কি জেনারেল রাওয়াতের কাছে এক অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে? মৃত্যু ডেকে এনেছে?

(৪) জেনারেল রাওয়াত চীন বিরোধী। তাই কি তিনি চীনা ষড়যন্ত্রের শিকার?

(৫) বিমান বাহিনীর কোনও গাফলতি ছিল কী?

(৬) কপ্টারটি মাওবাদী জঙ্গিদের শিকার হয়নি তো? অসম্ভব নয়।

(৭) কপ্টারটি অত নীচু দিয়ে উড়ানো হচ্ছিল কেন?

(৮) কপ্টারটি নাকি যে কোনও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, মেঘ-বৃষ্টি ও রাতের অন্ধকারেও উড়তে সক্ষম। তাহলে সেটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ল কেন? তখন তো দিনের আলো ছিল। গাছে ধাক্কা লাগার কথা উঠছে কেন?

(৯) কপ্টারটি কোনও অদৃশ্য ড্রোন মারণাস্ত্রের শিকার নয় তো?

(১০) জেনারেল রাওয়াতের পদটি রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই ওয়েলিংটনে অনুষ্ঠিতব্য একটি গুরুত্বহীন অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি কি খুবই প্রয়োজন ছিল?

উল্লেখ্য, একদিন আগে নয়াদিল্লিতে প্যানেক্স ২১-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সি ডি এস রাওয়াত জৈবযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ তার পরদিনই তিনি জীবনযুদ্ধে হেরে গেলেন। ভাগ্যের কী পরিহাস!

তিনিই আবার বলতেন, 'মেরা নাম সিপাহি হ্যায়'। তাই তিনি সর্বস্তরের সেনা-জওয়ানদের কাছে ছিলেন গ্রহণযোগ্য। তিনবাহিনীর মধ্যে তিনি সমন্বয় সাধন করে চলতেন। সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া নতুন সেনাদের উদ্দেশে বলতেন, ''নিছক একটা চাকরি রূপে একাজটাকে দেখবেন না, অগ্রাধিকার দেবেন মায়ের মতো দেশসেবাকে। আর এ জন্য প্রয়োজন শারীরিক ও মানসিক দৃঢ়তা।'' সেনাবাহিনীর মান্নোয়নে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি তাঁদের হাতে তুলে দিয়েছেন আধুনিক সমরাস্ত্র।

ডোকালাম ও প্যাংগং লেকের ধারে চীনা আগ্রাসন তাঁর দৃঢ় মনোভাবের কাছে পরাস্ত হয়েছে। আগ্রাসী চীনা সেনা পিছু হটতে হয়েছে বাধ্য। ২০১৬ সালে উরির সেনা ছাউনিতে পাক জঙ্গিদের বিধ্বংসী হামলার কড়া জবাব দিতে পাক জঙ্গি ঘাঁটিগুলি ধ্বংসে সার্জিকাল স্ট্রাইক ছিল তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত। এমনকী, জঙ্গি দমনে পাকিস্তানে ঢুকে মারার হুমকিও দিয়েছিলেন। তাঁর সময় বহু পাকজঙ্গি, সন্ত্রাসবাদী তাদের কমান্ডার মারা পড়েছে। তাঁরই উদ্যোগে সর্বাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় সেনা আজ ভারতবাসীর গর্ব। ডিমাপুরে তিনি কপ্টার দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন। কিন্তু বরাতজোরে রক্ষাও পেয়েছেন। তবে কুন্নুরে রাশিয়ার এম আই ১৭ ভি-৫ কপ্টার দুর্ঘটনা তাঁর জীবন কেড়ে নিয়েছে। স্ত্রী ও সহকর্মীদের সঙ্গে তিনিও হয়ে গেছেন 'উড়ন্ত কফিন'-এর একজন। এখন তিনি হয়ে গেছেন 'ইতিহাস'। দেশবাসীর একটাই দাবি, রহস্যাবৃত এই দুর্ঘটনার সত্য উদ্‌ঘাটিত হোক। কারণ দুর্ঘটনাটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশের নিরাপত্তা তথা অস্তিত্বের প্রশ্ন। □

সিলেবাসে আওরঙ্গজেব দক্ষ প্রশাসক, ধর্মান্ধ নন

শ্রী রাধাকান্ত ঘোড়াই

আধুনিক কালের ভারতের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে বা আলিগড়পন্থী ঐতিহাসিকদের মননে বা মার্ক্সীয় ঐতিহাসিকদের চিন্তা ভাবনায় আওরঙ্গজেব শুধুমাত্র একনিষ্ঠ ধর্মভীরু নয়, তিনি হলেন প্রজাবৎসল, ধর্মনিরপেক্ষ, সুশাসক ও একজন আদর্শবান বাদশাহ। ভারত শাসনে তার কাজকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা সেভাবে কোথাও প্রকাশ হয়নি। শাসন পরিচালনায় দক্ষতার আড়ালে তার ধর্মান্তরকরণের নীতি অনালোকিত রয়ে গেছে। তার কাছে অমুসলমানরা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবেই মান্যতা পেয়েছে। তাই কানপুর জেলার রাজপুত জমিদারদের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধার আড়ালে ধর্মান্তরকরণের কাজ করে গেছেন শুধু নয়, তার শাসনকালে বিভিন্ন ধরনের হিন্দু প্রশাসক, জমিদার ও নানান শ্রেণীর কর্মচারীদের সমানভাবে ইসলামের ছত্রছায়ায় আসতে বাধ্য করেছিলেন। এ বিষয়ে কানুনগো পদাধিকারীদের অবস্থা ছিল বেশ করুণ ও দুঃখজনক।

শুধুমাত্র জীবন, সম্পত্তি, পদ রক্ষা বা পদোন্নতির জন্য ইসলাম কবুল করতে হয়েছে গণ্যমান্যদের। যেমন, মনোহরপুরের জমিদার দেবীচাঁদকে ১৩ জুলাই ১৬৮১-তে ধর্মান্তরিত হতে হয়। দেবীচাঁদের পুত্র অমর চাঁদ মোগল দরবারের কর্মচারী হওয়ায় তাকেও ইসলামে আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হয়। অমরচাঁদের কন্যা তথা জগৎসিংহের ভগিনী কল্যাণ কুমারী ধর্মান্তরিত হয়ে জামিয়াত উনিসা নাম নিয়ে নবাবপুত্র কামবক্সকে ৩০ জুলাই ১৬৮১তে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধ্য করা হয়। রাও আনন্দ চাঁদের পুত্র ভবানী দাসকেও ইসলাম কবুল করতে হয়েছে। মনোহরপুরের রাও জগৎসিংয়ের পালিতা কন্যাকে হতে হয় জামালউদ্দিন নিসা বেগম। তেমনি বদায়ুন পরগনার সিকদার ভূধরও ইসলাম কবুল করেন। পুর ও বাধানপুরের ফৌজদার দলপত খানো বা শিবাজীর চিফ কমান্ডারকেও ইসলামের ছত্রছায়ায় আসতে বাধ্য করা হয়। এ তালিকা যেন শেষ হতে চায় না।

অনেক যুদ্ধবন্দি হিন্দু আজীবন জেলে থেকে মৃত্যুবরণ অথবা ইসলাম কবুল করে মুক্তি পাওয়ার নীতি গ্রহণ করেছিল। ঠিক তেমনইভাবে ১৬৮৫ খ্রিঃ ৭ এপ্রিল আওরঙ্গজেব ফৌজদার ও দেওয়ানদের আদেশ দেন যে, যদি দরিদ্র হিন্দুরা ইসলাম কবুল করে, তবে পুরুষেরা ৪ ও মহিলারা ২ টাকা হারে ইনাম বা পুরস্কার হিসেবে পাবে। আবার পরবর্তীকালে এও জানানো হয় যে, যেসব হিন্দু পরিবার ইসলাম কবুল করবে, সেই সব পরিবারকে ৬ টাকা ইনাম বা পুরস্কার দেওয়া হবে, সঙ্গে সঙ্গে বার্ষিক সাড়ে তিন টাকা জিজিয়া কর থেকে মুক্তি পাবে, যার মূল্য এক বছরের খাদ্যসামগ্রীর সমান। বিধুরের ফৌজদার সেক আবদুল মোমিন বাদশাহের দরবারে এসে গর্বের সঙ্গে জানান যে তিনি ১৫০ জন ক্ষুদ্র জমিদার ও সরকারি কর্মচারীকে ইসলামের ছত্রছায়ায় আনতে পেরেছেন। কানুনগো পদাধিকারীদের জীবন ছিল ভয়াবহ। এরাই ব্যাপকহারে ইসলামী কবুল করতে বাধ্য হয়। তার মধ্যে অন্যতম হলো খরি পরগনার কানুনগো ২২.৪.১৬৬৭ তারিখে, ১২.১৪.১৬৬৭০-তে ভোরী পরগনার জমিদার ও ঠাকুর পদবির চারজনকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। মিরাটের কানুনগো পরমানন্দ ইসলাম কবুল করেন ৪.৫.১৬৬৭ তারিখে। ওই একই তারিখে মুরারি ক্ষেত্রী ও মোহনদাস ক্ষেত্রী একই পথ ধরতে বাধ্য হন, আর ১৫.১১.১৬৮০-তে আলিপুরের কানুনগো মুরলীধরও একইভাবে ইসলাম কবুল করেন। ১৫.৬.১৬৮১-এ কালানুরে কানুনগো দেবী দাস ক্ষেত্রী ইসলামকে কবুল করতে বাধ্য হন।

একজন হিন্দু পুরুষকে ধর্মান্তরিত করলে চার টাকা এবং একজন হিন্দু মহিলাকে ধর্মান্তরিত করলে দু টাকা পুরস্কার দেওয়ার আওরঙ্গজেবের ফরমান (৭ এপ্রিল, ১৬৬৫)

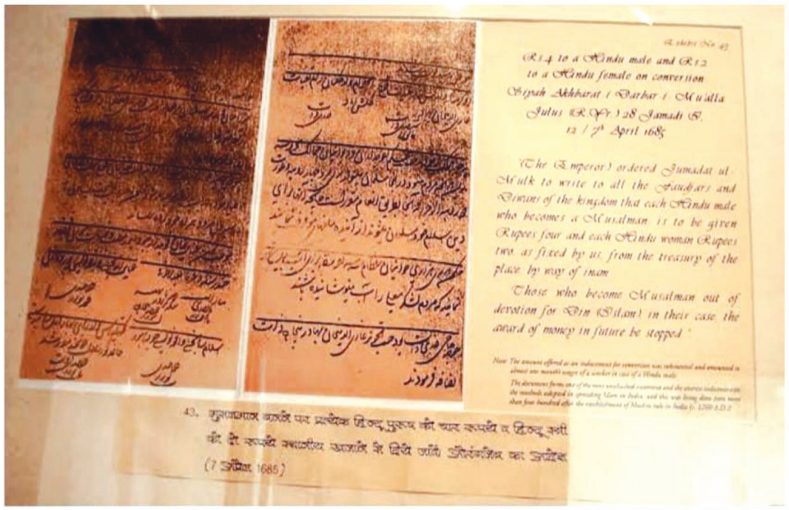

সৌজন্যে : Rajasthan State Archives, Bikaner.

বাঙ্গলার কেনারাম কানুনগো ১৯.১০.১৬৮১-তে ইসলাম কবুলে বাধ্য হন। শুধু তাই নয়, বহু কানুনগো পদাধিকারীদেরও একই অবস্থা হয়। রসুলপুরে ইন্দর সিং, সাধোনার দেবীচাঁদ, সামসাবাদের মায়া রাম, শিয়ালকোটে ভীম রাজরা ১৭০৪ সালে একই পথে আসতে বাধ্য হন। এ ছাড়াও অনেক নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীও ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম কেবলরাম, গিরিধারী লাল, রঘুপত গণেশ চৌধুরী ১১.৪.১৬৬৭-এ ধর্মান্তরিত হন। জগজীবনও ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন, তা ১৯.৯.১৬৬৬ তে জানা যায়। দেবগড়ের জমিদার দিলের খান শুধুমাত্র ভাইয়ের ছেলেরা যুদ্ধে হেরে গিয়ে বন্দি হয়ে যাওয়া থেকে মুক্তি পেতে ইসলাম কবুল করেন। আর রামপুরার রাও গোপাল সিংহের পুত্র রতন সিং ইসলাম খান হয়ে যান। ১৬৬০ সালে মোগলরা ঝাড়খণ্ডে পালামউ দুর্গ আক্রমণ করলে মেদিনী রায়ের পরাজয় হয়। দাউদ খানের নেতৃত্বাধীন মোগল বাহিনী হিন্দু স্থাপত্য, মন্দির, বিগ্রহ ধ্বংস করে। মেদিনী রায়কে ধর্মান্তরিত করার জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু তিনি জঙ্গলে আশ্রয় নেন। এ তালিকা বেশ বড়। শুধুমাত্র ধর্মান্তরিত করে ক্ষান্ত হয়নি, ব্যাপক হারে হিন্দু মন্দির ধ্বংস করার সঙ্গে সেই স্থানেই মসজিদ নির্মাণ, এ এক অমর কীর্তি।

২০.১১.১৬৬৫ খ্রি. গুজরাটে মন্দির ধ্বংস করে ফেলার জন্য ফরমান জারি করা হল। ৯.৪.১৬৬৭ দেওয়ালীতে আলো জ্বালানোতে নিষেধাজ্ঞা। ১৬.৪.১৬৬৭ প্রথমে জাকাত থেকে মুসলমানদের ছাড়া দেওয়া হয়, পরে সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়, তাতে মুসলমানদের ২.৫ শতাংশ ও হিন্দুদের ৫ শতাংশ হারে (জিনিসপত্রের মূল্যের ওপর) কর আদায়ের ফরমান জারি। ৩০শে মে ১৬৬৭ হিন্দু চৌকিদারদের বদলে মুসলমানদের নিয়োগের জন্য ফরমান জারি এবং কোর্টের (আদালত) হিন্দু কর্মচারীদের বদলে মুসলমানদের নিয়োগের জন্য ফরমান জারি।

৩.৯.১৬৬৭ দিল্লির কালিকা মন্দির ভাঙার জন্য নির্দেশ। ৯.৪.১৬৬৯ সারা দেশে হিন্দু মন্দির ও হিন্দুদের স্কুল ভাঙার জন্য নির্দেশ। মে ১৬৬৯, রাজস্থানের মালারনা মন্দির ভাঙার জন্য নির্দেশ। সেপ্টেম্বর ১৬৬৯, কাশী বিশ্বনাথ মন্দির (বারাণসী) ভাঙার নির্দেশ। ১৩.১.১৬৭০ মথুরার কেশারাই মন্দির ভাঙার জন্য নির্দেশ। ১১.২.১৬৭০ মথুরাতে মসজিদ নির্মাণ করার জন্য নির্দেশ ও মধুরার নাম বদলে ইসলামাবাদ করা। জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি ১৬৭০, উজ্জয়িনীতে সমস্ত মন্দির ভাঙার জন্য বাহিনী পাঠানো। জুন ১৬৭২, বাঙ্গলার সমস্ত পরগনাতে মন্দির ভাঙার জন্য নির্দেশ।

১৬৭৫-৭৬ হিন্দু পেসকার ও রেভিনিউ অফিসার এর বদলে মুসলমানদের নিয়োগ। ৮.৩.১৬৭৯, খান্দেলার মোহনজী ও খাতু শ্যামজী মন্দির ধ্বংস করা। ২৫.৩.১৬৭৯ খ্রি. মেওয়ারের বিভিন্ন মন্দির থেকে খানজান বাহাদুর বিভিন্ন ধরনের মূর্তি নিয়ে আসে এবং তা জামা মসজিদের সিঁড়িতে লাগানো হয়। ৪.১১.১৬৮০, উদয়পুরের জগন্নাথ রাই মন্দির ভাঙার জন্য সেনাবাহিনী পাঠায়। ২৪.১.১৬৮০, উদয়সাগর লেকের ধারে তিনটি মন্দির ভাঙার জন্য নির্দেশ। ২৯.২.১৬৮০, ২৯ জানুয়ারি আলি হোসেন খান উদয়পুরের মধ্যে ১৭২টি মন্দির ভেঙেছেন বলে বাদশাহের কাছে রিপোর্ট করেন। ২২.২.২৬৮০, চিতোরে ৬৩টি মন্দির ধ্বংস করে। ২০.৪.১৬৮০, আওরঙ্গজেব মিরাটে উপস্থিত হলে, এলাকায় সমস্ত মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১০.৮.১৬৮০, আওরঙ্গজেবের নির্দেশ মতো আবুতুরব অম্বর রাজ্যে মোগলরা ৬৬টি মন্দির ধ্বংস করে। ২৮.৩.১৬৮১ আওরঙ্গজেবের নির্দেশ মতো অম্বরের জগদীশ মন্দির ধ্বংস করে দেওয়া হয়। মে, ১৬৮১, কাবুল সুবার অন্তর্গত সরকার খোকতে রাজা মান্ধাতার মন্দির ধ্বংস করা হয় এবং হোসেন আলি খান মথুরাতে একটি মন্দির ধ্বংস করে। ১.৬.১৬৮১, পুরীর জগন্নাথ মন্দির ভাঙার জন্য নির্দেশ। ৩১.৯.১৬৮১, বাদশাহ বুরহানপুর যাওয়ার পথে সমস্ত মন্দির ভাঙার কথা বলেন। অক্টোবর ১৬৮১, বুরহানপুর ও সংলগ্ন এলাকায় সমস্ত মন্দির বন্ধ রাখার জন্য নির্দেশ। ১৩.৯.১৬৮২ বারাণসীর নন্দ মন্দির ভাঙার নির্দেশ। ১.১.১৬৮৩, রহমতপুর ও পেডগাঁওতে মন্দির ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য প্রিন্স আজম শাহকে নির্দেশ। সেপ্টেম্বর ১৬৮৩, গোলকোণ্ডা জয়ের পর নির্দেশ দেন হায়দরাবাদের মন্দির ধ্বংস করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানেই মসজিদ নির্মাণ করকে হবে। এপ্রিল ১৬৯০, ইলোরা, জাজুড়ি, ত্রিম্বাকেশ্বর, মন্দির ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ১৬৯৩, গুজরাটের বিদ্যানগরের হিতেশ্বর মন্দির ভাঙার জন্য নির্দেশ। ১৬৯৭-৯৮, সোমনাথ মন্দির ভাঙার জন্য নির্দেশ। জুলাই ১৭০৫, বিজাপুরের মন্দির ভাঙার নির্দেশ এবং পান্ধারপুরের মন্দির ধ্বংস করে দেওয়ার ও সেই স্থানে গোহত্যা করার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন।

এভাবে এক বিদেশি শাসকের হাতে ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতার যে অবনমন হয়, তা পাঠ্যসূচিতে ঠাঁই পায়নি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার 1. Emperor Aurangzeb and destruction of temples, V.S. Bhatnagar.
2. History of Aurangzib j.n.sarkar, vol. 3 & other.
মন্দির, মসজিদ, ফাহিয়েন, ও অন্যান্য পত্রিকা।

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

বামপন্থা ও পাশ্চাত্য ভাবধারা যখন বাংলা ছবিতে

'হীরক রাজার দেশে' ছবিতে উৎপল দত্ত।

রূপশ্রী দত্ত

বাম ও পশ্চিমি ভারধারার সমন্বয় একমাত্র দেখা যায় অভিনেতা উৎপল দত্তের মধ্যে। তাঁর জন্ম ২৯ মার্চ, ১৯২৯ ও মৃত্যু ১৯ আগস্ট, ১৯৯৩। তিনি বরিশালে জন্মেছিলেন। পিতার নাম গিরিজারঞ্জন দত্ত। উৎপল দত্ত অধ্যয়ন করেছিলেন সেন্ট লরেন্স স্কুল ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। কলেজ থেকে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পাশ করেছিলেন। বাংলা থিয়েটারে তাঁর কৃতিত্ব সর্বজনবিদিত কিন্তু ইংরেজি থিয়েটার দিয়েই তাঁর অভিনয় জীবন আরম্ভ হয়।

১৯৪৭ সালে The Shakespearians সিরিজে Richard III নাটকে অভিনয় করেন। তিনি 'little Theatre Group করেছিলেন ১৯৫৯ সালে। জার্মান নাট্যকার ব্রেখটের নাটক তিনি ইংরেজিতে অভিনয় করেছিলেন। বাংলা সামাজিক, রাজনৈতিক নাটকে তিনি মার্কসীয় ভাবধারা এনেছিলেন। যেমন— 'কল্লোল', 'মানুষের অধিকার', 'লৌহ-মানব (১৯৬৪)', টিনের তলোয়ার, 'মহাবিদ্রোহ'। চল্লিশ বছরের অভিনয় জীবনে তিনি একশোর বেশি বাংলা ও হিন্দি ছবি করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিচালক মৃণাল সেনের ছবি 'ভুবন সোম', সত্যজিৎ রায়ের 'আগন্তুক' (১৯৯১), গৌতম ঘোষের 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৯৩) এবং হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের দুটি হিন্দি কমেডি ছবি 'গোলমাল' (১৯৭৯) ও 'রঙ্গবেরঙ্গী' (১৯৮৩)।

টিভিতে 'ব্যোমকেশ' সিরিজে 'সীমান্তহীরা' নাটকে স্যার দিগীন্দ্রনারায়ণের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে। তিনি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন; কৌতুকাভিনেতা হিসেবেও পুরস্কার পেয়েছিলেন। সংগীত, নাটক, অ্যাকাডেমি ফেলোশিপ পেয়েছিলেন মঞ্চে আজীবন অবদানের জন্য। ডাকবিভাগও তাঁর অভিনয় প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিয়ে ছবি-সহ তাঁর নামে ডাকটিকিট প্রকাশ করেছিল। তাঁর স্ত্রী অভিনেত্রী শোভা সেন ও কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া।

উৎপল দত্ত গণনাট্য সংসদের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এই সঙ্ঘের সদস্যরা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে অভিনয় করতেন। তিনি সাউথ পয়েন্ট স্কুলে ইংরেজির শিক্ষকতাও করেছেন। রাশিয়ান ক্লাসিকস্, শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডি, ম্যাকসিম গোর্কির 'Lower Depth'-এরও অনুবাদ তিনি করেছেন ১৯৫৭ সালে। মিনার্ভায় 'অঙ্গার' নাটকে অভিনয় করেছিলেন। তাঁর কাজ দেখে বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মধু বসু কবি মধুসূদনের জীবনী অবলম্বনে 'মাইকেল মধুসূদন' ছবিতে নামভূমিকায় অভিনয়ের জন্য তাঁকে নিয়েছিলেন। এই ছবিতে তিনি মধুসূদনের প্রতিরূপ হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর ইংরেজি ভাষা, সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি, ইংরেজি কথোপকথনের আধিক্য যা ছবিতে প্রদর্শিত হয়েছে তা তাঁর নিজেরও স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য ছিল। মেক্ আপ মধুসূদনের আকৃতির অনুরূপ ছিল। তৎকালীন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা, 'মাইকেল মধুসূদন' ছবি দেখে এসে তাঁদের পাঠ্যপুস্তকের মধুসূদনের ছবির সঙ্গে সাদৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যেত।

উৎপল দত্ত খলনায়ক বা 'ভিলেন'-এর ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যেমন, অমিতাভ বচ্চন অভিনীত 'দি গ্রেট্ গ্যাম্বলার', 'ইনকিলাব'। তিনি আজীবন কমিউনিস্ট দলের সমর্থক ছিলেন। ১৯৬৫ সালে কংগ্রেস শাসনকালে তাঁকে কারাবরণও করতে হয়েছিল। তিনি যাত্রাদলও গঠন করেছিলেন। মুক্তমঞ্চে সে যাত্রা অভিনীত হতো। তাঁর অভিনীত বাংলা ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো :

'বিক্রম-উর্বশী' (১৯৫৪), 'টাকা আনা পাই' (১৯৬৬), 'শুভলগ্ন' (১৯৬২), 'রক্তপলাশ' (১৯৬২), 'মোমের আলো' (১৯৬৪)। □

বরাহমিহির

আলোকোজ্জ্বল ও জনাকীর্ণ রাজসভায় ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে বিরক্তির স্বরে রাজা বিক্রমাদিত্য জিজ্ঞাসা করলেন, 'এও কি সত্যি হতে পারে?'

রাজজ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্‌বাণীতে হতচকিত ও স্তব্ধ রাজসভা থেকে কোনও উত্তর এল না। তখন সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে শোকাচ্ছন্ন অথচ দৃঢ়স্বরে রাজজ্যোতিষী উত্তর দিলেন, হ্যাঁ মহারাজ, এটা আপনার কাছে যতই খারাপ লাগুক না কেন, কথাটা সত্যি। গ্রহ সমাবেশ অনুযায়ী ১৮ বছর বয়সে রাজকুমারের মৃত্যুর পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে।'

রাজা নিজেকে সংযত করে নিলেও রানি পারলেন না। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, মহারাজ, এই ভবিষ্যদ্‌বাণী যাতে মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় আপনি তার যতাসাধ্য চেষ্টা করুন। রাজজ্যোতিষী মিহিরের ওপর মহারাজের অগাধ বিশ্বাস। তথাপি পুত্রের প্রাণরক্ষার জন্য সবকরম সাবধানতা তিনি অবলম্বন করলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে একটি বরাহ রাজপুত্রকে হত্যা করল। রাজার কাছে এই সংবাদ পৌঁছানো মাত্রই তিনি মিহিরকে রাজসভায় ডেকে পাঠালেন।

তিনি মিহিরকে বললেন, 'আপনি জিতে গেছেন, আমি হেরে গেছি।' জ্যোতিষী রাজার থেকে কোনও অংশে কম শোকাতুর ছিলেন না। তিনি বললেন, 'মহারাজ, আমার জয় হয়নি। জয় হয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্রের।' রাজা বললেন, 'সে যাই হোক, আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে আপনার এই বিজ্ঞান সম্পূর্ণ সত্য। এই জ্ঞানের স্বীকৃতিস্বরূপ আমি মগধ রাজ্যের সর্বোচ্চ সম্মান বরাহ'র প্রতীকের দ্বারা আপনাকে

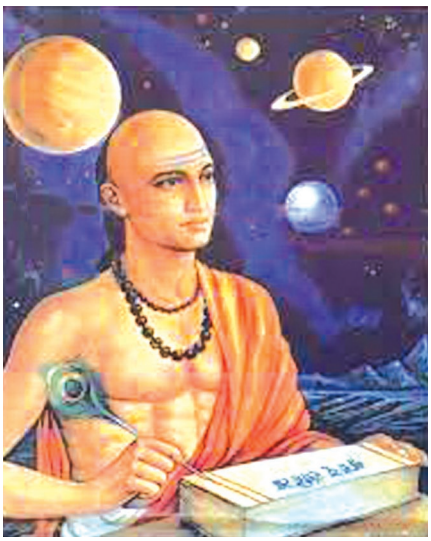

বিভূষিত করলাম।' সেইদিন থেকে মিহির 'বরাহমিহির' নামে পরিচিত হলেন।

উজ্জয়িনীর কাছে কপিত্থা গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ৪৯৯ খ্রিস্টাব্দে বরাহমিহিরের জন্ম। তাঁর পিতা আদিত্যদাস সূর্যের উপাসক ছিলেন এবং তিনিই মিহিরের জ্যোতিষশাস্ত্রের গুরু। একবার কুসুমপুরায় (পাটন) বেড়াতে গিয়ে যুবক মিহিরের সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গাণিতিক আর্যভট্টের সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎকার তাঁকে এতই অনুপ্রাণিত করে যে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্রকেই তাঁর জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন।

গুপ্তযুগে উজ্জয়িনী শিল্প, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। সেজন্য মিহির এই শহরে এসে বসবাস শুরু করেন। ওই সময়ে এই শহরে দূরদূরান্তের পণ্ডিতরা একত্রিত হয়েছিলেন। যথাসময়ে তাঁর জ্যোতিষবিদ্যার পারদর্শিতা রাজা বিক্রমাদিত্যের কানে আসে। তিনি তখন তঁকে নবরত্নের এক রত্ন হিসেবে তাঁর সভায় স্থান দেন। মিহির বহু দূরদেশ এমনকী গ্রিস পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন। ৫৮৭খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

বরাহমিহির বেদজ্ঞ ছিলেন কিন্তু অন্ধবিশ্বাসী ছিলেন না। আর্যভট্টের মতো তিনিও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি ঘোষণা করেন যে পৃথিবী বর্তুলাকার। তিনিই প্রথম দাবি করেন যে কোনও এক শক্তির আকর্ষণে এই পৃথিবীর ওপর বিভিন্ন বস্তু সংলগ্ন হয়ে আছে। এই শক্তি বর্তমানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নামে পরিচিত। তিনি বিজ্ঞান পরিবেশে জলবিজ্ঞান ও ভূবিজ্ঞানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছিলেন। উদ্ভিদ ও উইপোকা থেকে মাটির তলার জলের অস্তিত্ব জানা যায় একথা তিনিই বলে গেছেন। এখন বৈজ্ঞানিকরা এবিষয়ে দৃষ্টি দিচ্ছেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ছন্দে তাঁর যথেষ্ট দখল থাকার ফলে তাঁর রচনাভঙ্গির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল।

বিভিন্ন বিষয়ে বিশদজ্ঞান ও প্রকাশভঙ্গির মাধুর্যের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতো নীরস বিষয় নিয়ে লিখেও তিনি এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছিলেন। তাঁর পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, বৃদৎসংহিতা ও ব্রহ্মজাতক জ্যোতিষশাস্ত্রে এক উচ্চস্থান অধিকার করেছে। তিনি তাঁর গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন, 'জ্যোতিষশাস্ত্র এক মহাসমুদ্র, যে কোনও লোকের পক্ষে তা পাড়ি দেওয়া সহজ কথা নয়। তবে আমার এই গ্রন্থ এই সাগরে একটি নিরাপদ নৌকার মতো।' এটা তাঁর দম্ভ নয়। এখন পর্যন্ত তাঁর গ্রন্থগুলি আকরগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে।

(সংগৃহীত)

ভারতের বিপ্লবী

নগেন্দ্রনাথ দত্ত

নগেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৮৫ সালে ভোজপুর-শ্রীহট্টে। পিতা গোবিন্দচন্দ্র দত্ত ছিলেন সুনামগঞ্জের নামকরা উকিল। ছাত্রাবস্থায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। পরে ঢাকায় পুলিনবিহারী দাসের অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন এবং নিজের গ্রামে তার শাখা শুরু করেন। তিনি রাসবিহারী বসুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। দিল্লি ষড়যন্ত্র ম্যামলায় তাঁর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বেরোয়। কিন্তু তিনি সুকৌশলে আত্মগোপন করে বৈপ্লবিক কাজকর্ম চালাতে থাকেন। ১৯১৫ সালে তিনি ধরা পড়েন এবং কাশী ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হন। ১৯১৮ সালে আগ্রা জেলখানায় বিনা চিকিৎসায় তাঁর জীবনাবসান হয়।

জানো কী?

- এশিয়ার বৃহত্তম সোলার পার্ক –গুজরাটের চরণকা পার্ক।
- ভারতের বৃহত্তম সৌরপুকুর-- গুজরাটের মাধবপুরে।
- ভারতের অরণ্য গরেষণাকেন্দ্র-- দেরাদুনে।
- অজন্তা ও ইলোরা গুহা– মহারাষ্ট্রে।
- এলিফ্যান্টা গুহা– মুম্বাই।
- ভীমবেটকা গুহাচিত্র– মধ্যপ্রদেশে।
- খাজুরাহো গুহামন্দির– মধ্যপ্রদেশে।
- মহাবলীপুরমের সৌধসমূহ-- তামিলনাড়ুতে।

ভালো কথা

মন্দির পরিষ্কার

কালী পূজার মাঠেই আমাদের শাখা হয়। কালীপূজার পরদিন আমরা দাদুর সঙ্গে আমাদের শাখার মাঠে গিয়ে দেখি আগেরদিন কালীপূজা হওয়ার পুরো মাঠ আবর্জনায় ভর্তি হয়ে আছে। তা দেখে আমাদের মন খারাপ হয়ে গেল। আমরা দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম কী করা যায়। দাদু আমাদের এক লাইনে দাঁড়াতে বললেন, তারপর সবাই মিলে পরিষ্কার করতে শুরু করলাম। আধঘণ্টার মধ্যে মাঠ ঝকঝকে হয়ে গেল। দাদু বললেন আরেকটা কাজ বাকি আছে। শিবঠাকুর নোংরা হয়ে আছে। আবার সবাই মিলে পরিষ্কার করতে লাগলাম। কেউ জল ঢালতে লাগল, কেউ আবর্জনা পরিষ্কার করতে লাগল। দেখতে দেখতে শিবঠাকুরও ঝকঝকে হয়ে গেল। আমাদের সবার মন আনন্দে ভরে গেল। দাদু বললেন আজ আর খেলা হবে না, এটা খেলাই হলো। তারপর আমরা প্রার্থনা করে ফিরে এলাম।

প্রিয়ম দত্ত, সপ্তম শ্রেণী, মুরারীপুর, দঃ দিনাজপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

আমরাই যে তোমার বন্ধু

অনামিকা পাল, সপ্তম শ্রেণী, সেইন্ট কেপিটেনিও স্কুল, শিলচর।

কেটো না গো আর মোদের
হবে যে বিপদ তোদের,
প্রাণবায়ু কোথায় পাবি বল
আমাদের ছাড়া শুকিয়ে যাবে এ জগতের জল।
রোদের তাপ বাড়বে চরম
ছুটবে তোদের ঘাম–
বাড়বে তোদের বড়োই বিপদ
বলবে রাম রাম।
ধসবে পাহাড় শুকোবে সাগর
বাঁচাও বাঁচাও সবার মুখে,
মোদের ছাড়া পাবি না ফুল-ফল
তখন চোখে অশ্রু করবে টলমল।
তাই বলছি দেরি না করে লাগাও একটি চারা
জোরে বলো হয়ে আত্মহারা–
'চলে এসে মোরা গাছ লাগাই
চলো মোদের প্রাণ বাঁচাই।'

কবিতা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

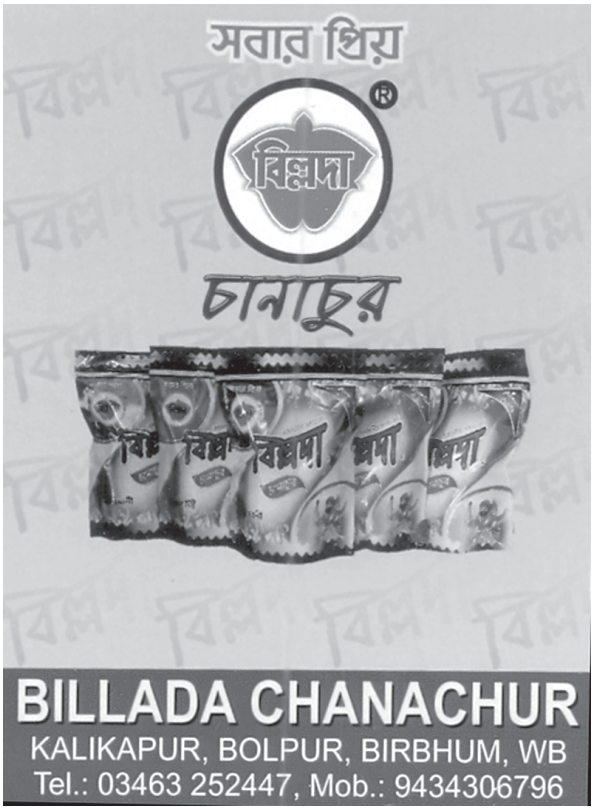

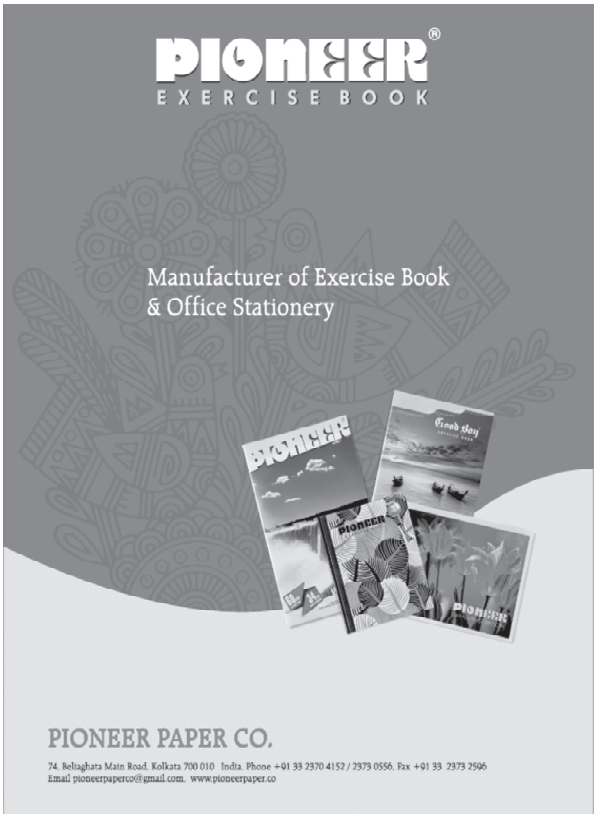

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

ঈশাইনাথের সন্ধানে

কিংবদন্তী বলে, আইশমোকামে সংরক্ষিত লাঠি ব্যবহার করেছিলেন ঈশাইনাথ

দেবাশিস চৌধুরী

সমগ্র বিশ্বের মানুষ যে দুজনের অন্তর্ধান নিয়ে সবথেকে বেশি কৌতূহল দেখিয়েছে তার একজন যদি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু হন তবে অপরজন অবশ্যই যিশুখ্রিস্ট। তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যুর সপক্ষে যতই সরকারি সিলমোহর পড়ুক না কেন, যুক্তিযুক্ত হাজারো প্রশ্নের সঠিক উত্তর যেমন আজও মেলেনি, ঠিক তেমনটি যিশুখ্রিস্টের ক্ষেত্রেও। যিশু ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর যে গল্পটি চার্চ প্রচার করে তা আদৌ কতটা যুক্তিগ্রাহ্য তা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠলেও চার্চের তরফ থেকে আজ অবধি কোনও সন্তোষজনক ব্যখ্যা মেলেনি। যেমন ব্যাখ্যা মেলেনি যিশুখ্রিস্টের তেরো বছরের পর থেকে তিরিশ বছরের আগে অবধি তাঁর জীবন কাহিনিরও। যিশুখ্রিস্টের এই অজানা জীবনের কথা যদি উন্মোচিত হয় তবে এটা নিশ্চিত যে চার্চের পক্ষে যিশুর উপর একচেটিয়া দখলদারিত্ব বজায় রাখা কঠিন হয়ে উঠবে। কোনও ভাবালুতা দিয়ে নয়, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি ঘটনাপ্রবাহের চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করা যায় তবে দেখা যাবে যিশুর আদর্শ, যিশুর দর্শন, যিশুর বাণী একান্ত ভাবেই ভারতীয়—আরও পরিষ্কার করে বললে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মমতের থেকে বিশেষ আলাদা কিছু নয়।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, ভারতবর্ষ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে ইহুদি পরিবারে জন্ম নেওয়া একজন মানুষের জীবনে ভারতীয় দর্শনের (হিন্দু ও বৌদ্ধ) প্রভাব কীভাবে পড়তে পারে? উত্তর খুঁজতে তৎকালীন

প্যালেস্টাইন ও মিশরের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। রাজা হেরডের ভয়ে যোশেফ ও মা মেরি গ্যালিলি প্রদেশের নাজারেথ নগরী থেকে ছোট্ট যিশুকে নিয়ে মিশরে যে সময়ে পালিয়ে এসেছিলেন (হেরডের মৃত্যুর পর পুনরায় নাজারেথে ফিরে যান), জার্মান ঐতিহাসিক (ধর্ম বিষয়ক) হোলগার কারস্টেনের মতে তখন সেখানে ছিল লক্ষাধিক ইহুদির বসতি ও কয়েকশো বৌদ্ধ বিহার এবং আলেকজান্দ্রিয়া ছিল বৌদ্ধধর্ম চর্চার কেন্দ্রভূমি। (প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখি, হোগার কারস্টেনের তিনটি বই Jesus Lived in India (1983), The Original Jesus (1994) এবং The Jesus Conspiracy (1997) একসময় বিশ্বে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল।) সেই সময় ইহুদীদের মধ্যে দুটি মুখ্য সম্প্রদায়—ফারিশি (Pharisees) ও সাদ্দুসি (Sadducees) ছাড়াও এসেনিস (Essenees) নামে অপর একটি সম্প্রদায় মিশর ও প্যালেস্টাইনে বাস করত। এসেনিসদের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের চল ছিল এবং সেই সূত্রে মিশরীয় এবং ভারতীয় এই দুই সভ্যতার সঙ্গেই এদের যোগাযোগ ছিল। যিশু ছিলেন এই এসেনিস সম্প্রদায়ভুক্ত। এসেনিসরা ফারিশি ও সাদ্দুসিদের মতো কট্টরবাদী ইহুদি মতবাদ অনুসরণ করত না বরং এদের মতবাদ ছিল অনেকটা বাঙ্গলার চৈতন্যদেব ও বাউলদের মতো উদার প্রেমধর্মের অনুসারী। এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ধর্মযাজক (রাব্বি) বৌদ্ধভিক্ষুদের মতো বিবাহ করতেন না। এঁরা মন্দিরে বলি প্রথার বিরোধী ছিলেন এবং ব্যভিচার না করা, চুরি না করা, মিথ্যা না বলার মতো বৌদ্ধ-অষ্টাঙ্গিক মার্গ মেনে চলতেন। প্রসঙ্গক্রমে যিশুর ব্যাপটাইজ বা দীক্ষা গ্রহণের প্রক্রিয়াটিও স্মরণে রাখা উচিত হবে। যিশুর তিরিশ বছর বয়সে তাঁর মাসতুতো দাদা ধর্মযাজক (রাব্বি) যোহান (John the Baptist—মা মেরির দিদি এলিজাবেথের পুত্র) ডেডসি ও জর্ডন নদীর সঙ্গমের কাছে যিশুকে ব্যাপটাইজ করেছিলেন তাঁর সারা অঙ্গে জর্ডন নদীর জল ছিটিয়ে দিয়ে (মতান্তরে যিশু নিজেই জর্ডন নদী থেকে স্নান করে উঠে এসেছিলেন) যা ছিল একান্তই এসেনিসদের প্রথা, এই প্রথা ফারিশি ও সাদ্দুসিদের মধ্যে প্রচলিত তো ছিলই না বরং

বৌদ্ধভিক্ষুরা নতুন শ্রমণদের এইভাবে দীক্ষিত করতেন। 'এসেনিস' শব্দটির অভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'বহিরাগত', এটা হতে পারে যে তৎকালীন সময়ে বহিরাগত বৌদ্ধধর্মের উদারনৈতিক ভাবধারার প্রভাব এসেনিসদের উপর পড়েছিল বলে তাদের সম্প্রদায়ের এরূপ নামকরণ করা হয়েছিল।

যিশুর উদারনৈতিক ভাবনার প্রথম প্রকাশ দেখা যায় জেরুজালেমের মন্দিরে। ইহুদিদের প্রাচীন একটি উৎসবের নাম পাস ওভার (Pass Over), সন্তান এগারো বা বারো বছরে পদার্পণ করলে জেরুজালেমের মন্দিরে তাকে নিয়ে গিয়ে উৎসবে যোগদান করানো একটি বিশেষ প্রথা হিসাবে গণ্য হতো। সেইমতো বালক যিশুও পরিবারের সঙ্গে এসে উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। উৎসব উপলক্ষ্যে মন্দিরে আগত ধর্মগুরুদের সঙ্গে তাঁর ধর্মীয় আলাপ আলোচনা ও শাস্ত্রজ্ঞান তাঁদের বিস্মিত করেছিল এবং বালক যিশুর সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক প্রশ্নে তাঁরা অবিভূত হয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন, যিশু এইসব তত্ত্বকথা শিখলেন কোথা থেকে? বৃদ্ধ হোক বা বালক যদি সম্যক জ্ঞান ও চর্চা না থাকে তবে কারুর পক্ষেই আলাপ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে ফেলা সম্ভবপর নয়। সুতরাং এটা ধরে নেওয়া যেতেই পারে মিশরে থাকার সময় থেকেই তাঁর উপর বৌদ্ধ-প্রভাব পড়েছিল কারন একমাত্র ভারতীয় সংস্কৃতিই দিয়েছে ধর্ম ও ধর্মীয় রীতিনীতিকে প্রশ্ন করার অধিকার—অন্য ধর্মে বিনা প্রশ্নে শুধুমাত্র পালন করতে হয়, যেমনটি সেই সময়ে ফারিশি ও সাদ্দুসিরা করতেন। মজার বিষয়, বালক যিশুর এই একটি ঘটনা ছাড়া তাঁর বাল্যকালের ধর্মীয় চেতনা সংক্রান্ত আর অন্য কোনও ঘটনার কথা জানা যায় না। এরপর সরাসরি তাঁর জীবনের তিরিশ থেকে তেত্রিশ বছর পর্যন্ত কালপর্বের কথা জানতে পারি। তাঁর এই ষোলো বা আঠারো বছরের মধ্যবর্তী সময়ের জীবনকাল, অর্থাৎ এগারো বা তেরো বছর বয়স থেকে তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি কোথায় ছিলেন, কী করেছেন ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে মতভেদ। সেন্ট লিউক শুধুমাত্র এইটুকু বলেছেন, দীর্ঘকাল প্রভু মরুভূমিতে কাটিয়ে ফিরে এলেন।

কানাঘুষো বাদ দিলে প্রথম যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণটি সামনে আসে ১৮৯৪ সালে। নিকোলাই আলেকজান্দ্রিভিচ নটোভিচ সংক্ষেপে নিকোলাস নটোভিচ নামে একজন রুশ সাংবাদিক তাঁর কাশ্মীর ও লাদাখ ভ্রমণের উপর The Unknown Life of Jesus Christ নামে একটি বই লেখেন। এই বইটি থেকেই সর্বপ্রথম বিশ্ববাসী যিশুর এগারো বা তেরো বছর বয়স থেকে তেত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত জীবনের কথা জানতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখা উচিত, এই বইটি কিন্তু কোনো গবেষণামূলক মৌলিক বই নয়। ১৮৮৭ সালে হেমিস গুম্ফা ভ্রমণের সময় নটোভিচ একটি তিব্বতীয় ভাষায় লেখা পাণ্ডুলিপির সন্ধান পান, পাণ্ডুলিপিটির প্রথম থেকে চতুর্দশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত যিশুর মর্ত্যে আগমনের পটভূমি থেকে ক্রুশবিদ্ধ হওয়া এবং সমাধি কক্ষ থেকে তাঁর মরদেহ অদৃশ্য হয়ে যাওয়া অবধি বিবরণ দেওয়া আছে। নটোভিচ এই পাণ্ডুলিপিটির শুধুমাত্র অনুবাদ করেছেন—নিজে কিছু লেখেননি। মূল পাণ্ডুলিপিটি প্রথমে পালি ভাষায় লেখা হয় এবং মগধ ও নেপাল হয়ে অবশেষে তিব্বতে লাসার কাছে মারবুর পাহাড়ের মঠে এসে পৌঁছায় 200CE নাগাদ। তারপর থেকে পাণ্ডু লিপিটিকে এখানেই স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত করা হয়। হেমিস গুম্ফায় রক্ষিত তিব্বতীয় ভাষায় লেখা পাণ্ডু লিপিটি প্রকৃতপক্ষে পালি ভাষায় লেখা লাসার মূল পাণ্ডুলিপিটির অনুবাদ মাত্র। লাসায় রক্ষিত মূল পাণ্ডুলিপিটি লেখা হয় যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার বছর তিনেক বাদে এবং তথ্যসূত্র হিসাবে পাণ্ডুলিপির প্রথম পরিচ্ছেদের পঞ্চম অনুচ্ছেদে লেখা রয়েছে— ব্যবসাসূত্রে যে সমস্ত বণিক ইজরাইলে যেতেন তাঁদের কাছ থেকেই এই বিবরণ পাওয়া গিয়েছিল। সুতরাং পাণ্ডুলিপিটির তথ্যসূত্রের মান্যতা নিয়ে মতভেদ থাকার অবকাশ নেই। চতুর্থ পরিচ্ছেদের দ্বাদশ অনুচ্ছেদ থেকে অষ্টম পরিচ্ছেদের চতুর্থ অনুচ্ছেদ অবধি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রয়েছে যিশুর গৃহত্যাগের কারণ থেকে আরম্ভ করে তাঁর ভারতে আগমন, ভারতে শিক্ষাগ্রহণ, ভারতে শূদ্রদের মধ্যে ধর্ম প্রচার, প্রচারে বাধা ও প্রাণনাশের চেষ্টা, নেপালে গমন ও শিক্ষা লাভ। পরিশেষে ভারত থেকে পারস্যে (ইরান) গমন ও জরথুস্ট্রীয়দের দ্বারা প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে মরুভূমিতে নির্বাসন এবং ঈশ্বরের কৃপায় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে পুনরায় জেরুজালেমে আগমন পর্যন্ত। অর্থাৎ পাণ্ডুলিপির এই অংশ থেকে পরিষ্কার যিশুর তিরিশ বছর বয়সে মরুভূমি থেকে পুনরাগমনের কথা যা সেন্ট লিউক বলেছেন তা সঠিক। সুতরাং পাণ্ডুলিপির এই অংশ যদি সঠিক হয় তবে অন্য অংশকেও সঠিক হিসাবে গণ্য না করার মতো বিপরীত যুক্তি এখনো অবধি সামনে আসেনি। যদিও অনেকেই বলে থাকেন, যিশু যেহেতু নিজমুখে বলেননি তিনি এইসময়টি ভারতবর্ষে ছিলেন তাই সেদেশে তাঁর থাকাটা আদৌ যুক্তিগ্রাহ্য নয়। অতিসরলীকৃত এই যুক্তির বিপক্ষে এইটুকু বলা যায়, পাণ্ডু লিপিটির দশম পরিচ্ছেদের দশম অনুচ্ছেদে লেখা আছে—জেরুজালেমে প্রবচনকালে যিশুকে শ্রোতারা প্রশ্ন করলেন, তুমি কে? কোথা থেকে এসেছো? তখন যিশু পরিষ্কার বললেন, আমি একজন ইজরায়েলি, অল্প বয়সেই স্বদেশ ত্যাগ করে অনিশ্চিতের পথে পাড়ি দিয়েছিলাম, বিদেশে আমার বহু বছর কেটেছে।

নিকোলাস নটোভিচের বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকের মতো শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী অভেদানন্দেরও ওকে প্রতারক বলে প্রথমে মনে হয়েছিল। ১৯২১ সালে আমেরিকা থেকে ফিরে স্বামী অভেদানন্দ চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মেটাতে ১৯২২ সালে স্বয়ং কাশ্মীর ও লাদাখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। স্বামীজীর কাশ্মীর ও লাদাক ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন তাঁর নিত্যসঙ্গী ও সেবক ব্রহ্মচারী ভৈরব চৈতন্য। ভ্রমণকালে স্বামীজী ডায়রিতে তাঁর প্রতিদিনের ভ্রমণ-কাহিনি লিখে রাখতেন। পরে স্বামীজীর নির্দেশে তিনি ওই ডায়রিটিকে ভিত্তি করে 'কাশ্মীর ও তিব্বতে স্বামী অভেদানন্দ' শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। আশ্চর্যের বিষয়, এই বইটিতে হেমিস গুম্ফার পাণ্ডুলিপিটির যে অনুবাদ স্বামীজী লিপিবদ্ধ করেছেন তার সাথে নিকোলাস নটোভিচের

করা অনুবাদ প্রায় এক। পঁয়ত্রিশ বছরের ব্যবধানে দুজন ভিন্নধর্মী মানুষের করা একইরকম অনুবাদ এটা প্রমাণ করে নিকোলাস নটোভিচ প্রতারক নন। হেমিস গুম্ফার এই পাণ্ডুলিপিটি ছাড়াও যিশুর ভারতে আসা ও ধর্মপ্রচারের স্বপক্ষে 'গ্লস মিরর' নামে আর একটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি থেকে তথ্য পাওয়া যায়। ডঃ ফিদা হুসেন একসময় কাশ্মীরের আর্কাইভ ও আর্কিওলজিক্যাল রিসার্চ এবং মিউজিয়মের ডিরেক্টর ছিলেন। ইনি 'A Search for the Historical Jesus' নামে একটি বই লেখেন এবং এই বইটিতে উল্লেখ করেন 'The History of Religion and Doctrines–The Glass Mirror' নামক এক চীনা ভাষায় লেখা প্রাচীন পাণ্ডুলিপির কথা। এই চীনা পাণ্ডুলিপিটি তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন Le-zan Chhes-kyi Nima নামক এক ব্যক্তি এবং পাণ্ডুলিপিটির নাম দেন 'The Grub-Tha-Thamas-Chad' বা 'Grugtha Thams–chand kyi Khuna dan Dod-Thsul Stone-pe Legs Shad Shel-gyi Melong'। ডঃ ফিদা হুসেন এই তিব্বতীয় ভাষায় অনুদিত পাণ্ডুলিপিটি সংগ্রহ করেন এবং তাঁর লেখা বইয়ে রেফারেন্স হিসাবে সেই পাণ্ডুলিপির ৪৭১ এবং ৪৭২ পৃষ্ঠার উল্লেখ করে যিশুর এশিয়াতে ধর্মপ্রচারের প্রমাণ তুলে ধরেন। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত জননেতা বিপিন চন্দ্র পালের একটি প্রবন্ধ স্মরণে রাখা উচিত হবে। ১৩৩০ সালের মাঘ মাসে প্রবাসী পত্রিকায় তিনি লেখেন, সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একবার নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আরাবল্লী পর্বতে গিয়েছিলেন। এই নাথ সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন ঈশাইনাথ নামে এক সিদ্ধযোগী যাঁর জীবনী নাথযোগীদের ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে এবং এই ঈশাইনাথের জীবনী যিশুখ্রিস্টের জীবনীর সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। আবার কেউ কেউ বলেন বিন্ধাচল পর্বতে নাথযোগী চেতননাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে যিশু সাধনান্তে সিদ্ধিলাভের পর ঈশাইনাথ নামে পরিচিত হন ও ধর্মপ্রচার করেন। এছাড়া পাক অধিকৃত কাশ্মীরের নিলাম উপত্যকার সারদাপীঠে যিশুখ্রিস্টের শিক্ষাগ্রহণের কথাও বহুল প্রচারিত। প্রসঙ্গক্রমে দুটি বিষয় মনে রাখতে হবে, প্রথমত হেমিস গুম্ফার পাণ্ডুলিপি অথবা গ্লাস মিরর নামক পাণ্ডুলিপিতে কিন্তু সেই বিষয়ের কোনো উল্লেখ নেই। দ্বিতীয়ত কাশ্মীরের প্রামাণ্য ইতিহাস কলহণ রচিত রাজতরঙ্গিনীতেও যিশুর কোনও উল্লেখ নেই। তবে হেমিস গুম্ফার পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী (পঞ্চম পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদ) সিন্ধু নদ পেরিয়ে আর্যভূমিতে চতুর্দশ বয়সে প্রবেশের পর শুধুমাত্র তাঁর আর্যজাতির সঙ্গে বসবাসের কথা উল্লেখ আছে–শিক্ষাগ্রহণের বিষয় উল্লেখ নেই। (প্রসঙ্গত স্মরণ রাখা দরকার, এইসময়ে গান্ধার সংলগ্ন অঞ্চলের রাজা ছিলেন হয় শকরাজ দ্বিতীয় আজেস (Azes II), নতুবা পহ্লবরাজ গন্ডোফার্নিস। কিন্তু তাঁর ঊনত্রিশোর্ধ্ব বয়সকালে ইজরায়েলে প্রত্যবর্তনের সময় নিশ্চিত ভাবেই এইকথা বলা যায়, তখন পহ্লবরাজ গন্ডোফার্নিস উক্ত অঞ্চলের রাজা ছিলেন)। এরপর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শুরু হচ্ছে—তিনি পঞ্জাব অতিক্রম করে রাজপুতানায় এলেন। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, তিনি যদি নিছক জ্ঞানার্জন ও বৌদ্ধধর্মের অনুশীলনের জন্য ভারতে আসতেন তবে তাঁর পক্ষে তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ই তো ছিল আদর্শ স্থান। কিন্তু এখানে না এসে তিনি (পঞ্চম পরিচ্ছেদ অনুযায়ী) পুরী, কাশীর মতো হিন্দু ভাবধারার প্রাণকেন্দ্রগুলি বেছে নিলেন কেন? কারণ সনাতন ধর্ম—যা বৌদ্ধধর্মের মাতৃস্বরূপা, তিনি সেই সনাতন ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ জানতে–বিশেষত অষ্টাঙ্গিক যোগমার্গের শিক্ষালাভ করতে ভারতে এসেছিলেন।

এবার আলোচ্য বিষয় তেত্রিশ বর্ষীয় যিশু ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর তাঁর দ্বিতীয়বার ভারতে আগমন, অবস্থান ও দেহরক্ষা। হেমিস গুম্ফার পাণ্ডুলিপির সমসাময়িক একটি প্রাচীন ল্যাটিন ভাষায় লেখা চিঠি যা যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সাত বছর পর লেখা হয়েছিল, প্রেরক ছিলেন যিশুখ্রিস্টের একজন ব্যক্তিগত বন্ধু জেরুজালেম নিবাসী এসেনিস সম্প্রদায়ভুক্ত ইহুদি আর প্রাপক ছিলেন ওই বন্ধুটির গুরুভাই আলেকজান্দ্রিয়া নিবাসী এসেনিস সম্প্রদায়ভুক্ত অপর একজন ইহুদি। এই চিঠিটি একজন জার্মান অনুবাদক ইংরেজিতে অনুবাদ করে 'The Crucifixion by An eye-Witness' নাম দিয়ে ১৮৩৭ সালে পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ করেন। বইটি প্রকাশিত হবার পর নিষিদ্ধ তো হলোই উপরন্তু বইটির সমস্ত কপি এবং মুদ্রণের প্লেটগুলি অবধি ধ্বংস করা হলো। অত্যাশ্চর্যজনকভাবে ১৯০৭ সালে বইটির একটি কপি আমেরিকায় পাওয়া যায় এবং এটি আজও 'লাইব্রেরি অব কংগ্রেস' লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রয়েছে। বইটিতে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে মূল চিঠিটি উদ্ধার হওয়ার ইতিহাস থেকে শুরু করে যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া এবং পরবর্তীকালে তাঁর কারমেল উপত্যকার পাহাড় থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া অবধি পুরো ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ৬৭ থেকে ১১৮ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কৌতূহলের বিষয়, বইটির ৬৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত যিশুর বন্ধু নিকোডেমাসকে একজন উচ্চমার্গের থেরাপুট (Terapeuts) বিশেষজ্ঞরূপে চিহ্নিত করা হয়ছে। (এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের জাহাজে ক্রিট দ্বীপ, থেরাপুট ও যিশুখ্রিস্ট বিষয়ক অত্যাশ্চর্য স্বপ্নের বিষয়টি স্মরণে রাখা উচিত হবে। আশ্চর্যের বিষয়, পরবর্তীকালে ওই অঞ্চলের কুমরান নামের এক গুহা থেকে 'কুমরান পুঁথি' বা 'Dead Sea Scrolls'গুলি আবিষ্কৃত হয়।) বইটির ১১৭ পৃষ্ঠায় পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে, যিশু পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যখন নামছিলেন (পাহাড়ের অপর পৃষ্ঠে?) ঠিক তখনই রক্তাভ কুয়াশা তাঁকে ঘিরে ধরে। (এরপর তাঁকে আর কেউই দেখেনি) আইনের চোখে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানের গুরুত্ব কতটা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং যিশু যে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যাননি তা এর থেকেই প্রমাণ হয়ে যায়।

স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, যিশুখ্রিস্ট যদি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা না যান তবে তিনি গেলেন কোথায়? উত্তর খোঁজার আগে তৎকালীন মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের দিকে

নজর দেওয়া প্রয়োজন। 37BCE নাগাদ পার্থিয়ানদের হাতে পরাজিত হয়ে রোমান সাম্রাজ্যের অধীনস্থ জুডার রাজা হেরড একসময় রোমে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন মিশরের রানি ক্লিয়োপেট্রার সহযোগিতায় এবং অ্যান্টনির পার্থিয়া অভিযানের সময় থেকেই রোম ও পার্থিয়ার মধ্যে সম্পর্ক আরও তিক্ত হয় যা বহু বছর স্থায়ী ছিল। এমনকী যিশুখ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময়েও ছিল। স্বভাবতই তখন তাঁর পক্ষে একমাত্র নিরাপদ জায়গা ভারত, বিশেষত গান্ধার। কারণ ওই অঞ্চল তখন পার্থিয়ান-বংশীয় পহ্লবরাজ গন্ডোফার্নিসের অধীন, এছাড়া ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁর পূর্ব-পরিচিতও বটে। 'The Acta Thomae'—এটি এমন একটি দলিল যা 495CE-তে উন্মুক্ত হয়, এতে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে 49CE-তে গান্ধারের রাজধানী তক্ষশীলায় রাজপরিবারের এক বিবাহ অনুষ্ঠানে টমাস ও যিশু উপস্থিত থেকে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করেছিলেন (Ante-Nicene Christian Library, Edinburgh, T & T Clark, 25 Vols. 1869, Vol. 20:46)। তবে 49CE-তে তক্ষশীলা সম্ভবত গন্ডোফার্নিসের অধীন ছিল না। কারণ পাকিস্তানের খাইবার-পাখতুনখোয়া প্রদেশের অন্তর্গত মার্দানের বৌদ্ধস্তূপ 'Takhat-i-Bhai'—এর শিলালিপিতে গন্ডোফার্নিসের রাজত্বকাল 19CE-45CE উৎকীর্ণ আছে। অপরদিকে এটাও ঐতিহাসিক সত্য, সেন্ট টমাস গন্ডোফার্নিসের রাজত্বকালে তাঁর রাজদরবারে এসেছিলেন এবং তাঁকে ও তাঁর ভাই গদ (GOD) কে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, ইহুদি-ধর্মে কিন্তু ধর্মান্তরকরণ স্বীকৃত নয়। সেই সময়ে এই প্রথা বৌদ্ধদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সুতরাং এটা ধরে নেওয়া যেতেই পারে, এই ধর্মান্তরকরণ প্রথা যিশু বৌদ্ধদের থেকে গ্রহণ করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, স্বনামধন্য ঐতিহাসিকগণের মতে সেন্ট টমাস ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে 52CE-তে সরাসরি জুডা থেকে এসে কেরালার মালাবার উপকূলে নেমেছিলেন। তাহলে প্রকৃতপক্ষে সত্য কি এটাই, সেন্ট টমাস জুডা থেকে নয় বরং তক্ষশীলা থেকে স্বয়ং যিশুখ্রিস্টের নির্দেশেই করাচি বা গুজরাটের কোন বন্দর থেকে যাত্রা করে মালাবার উপকূলে এসেছিলেন তাঁর শিক্ষা ও বাণী প্রচার করতে?

পরবর্তী সময়ে সেন্ট টমাসের কথা ঐতিহাসিকভাবে জানা গেলেও যিশুখ্রিস্ট চলে গেলেন অন্তরালে। গন্ডোফার্নিসের মৃত্যুর পর তাঁর রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গিয়েছিল। এইসময় কুষাণরাজ প্রথম কদফেসিস (রাজত্বকাল ঃ 15CE-65CE) কাবুল থেকে ঝিলাম নদী অবধি তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। প্রথম কদফেসিসের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় কদফেসিস (রাজত্বকাল : 65CE-75CE) রাজত্ব করেন, তারপর 78CE-তে কণিষ্ক রাজা হন এবং 'শকাব্দ' নামের সংবৎ প্রচলন করেন। অনেক ঐতিহাসিকদের মতে কুষাণরা শকেদেরই একটি শাখা ছিল। আশ্চর্যের বিষয় কাশ্মীরের প্রামাণ্য ইতিহাস কলহন রচিত রাজতরঙ্গিণীর প্রথম তরঙ্গের মধ্যভাগে তুরস্কদেশীয় হুষ্ক-জুষ্ক-কণিষ্ক নামে তিন রাজার উল্লেখ থাকলেও তাঁদের বিষয়ে বর্ণনা অতি সংক্ষিপ্তাকারে আছে। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই অংশে সময়ের একটি আন্দাজ পাওয়া যায়। কলহনের মতে এই সময়টি বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের দেড়শো বছর পর। অথচ আমরা সবাই জানি বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুর শাসনকাল (আনুমানিক 492BCE-460BCE)-এর প্রথমদিকে বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করেছিলেন। অর্থাৎ আনুমানিক 491BCE, মতান্তরে আনুমানিক 483BCE। প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখতে হবে, কলহন রাজতরঙ্গিণীতে যে অব্দ ব্যবহার করেছেন তা কিন্তু 'লৌকিকাব্দ'। লৌকিকাব্দের মান সাধারণাব্দ বা CE-এর নিরিখে এক একজন গবেষক এক একরকম দেখিয়েছেন। তাই লৌকিকাব্দের জটিলতায় না ঢুকে আমি প্রচলিত ইতিহাস বইয়ের তারিখ গ্রহণ করেছি। রাজতরঙ্গিণীর ওই অংশে নাগার্জুনের উল্লেখ থাকায় হুষ্ক ও জুষ্ক নামক এই দুই রাজাকে কণিষ্ক পূর্ববর্তী প্রথম কদফেসিস ও দ্বিতীয় কদফেসিস হিসাবে চিহ্নিত করা সহজ হয়েছে। কণিষ্কের পরবর্তী ১৮তম রাজা হিসাবে কলহণ গোপাদিত্য এবং তাঁর পরবর্তী ১০ম রাজা হিসাবে দ্বিতীয় তরঙ্গের শেষভাগে সন্ধিমান (আর্যরাজ) নামক রাজার নাম উল্লেখ করেছেন। রাজতরঙ্গিণীতে উল্লেখ রয়েছে, কাশ্মীররাজ গোপাদিত্য তাঁর রাজত্বকালে গোপাদ্রিতে জ্যেষ্ঠেশ্বরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। (কিন্তু 1420CE-তে মোল্লা নাদরির লেখা তারিখ-ই-কাশ্মীর গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে সংস্কার করেছিলেন)। শ্রীনগর শহরের কাছে শঙ্করাচার্য পাহাড়ের মাথায় আজও এই মন্দিরটি স্বমহিমায় বিদ্যমান এবং বৌদ্ধরা এই মন্দিরটিকে এখনও 'পাশ-পাহাড়' নামে ডাকে। আজ থেকে প্রায় ২,৫০০ বছর আগে, অর্থাৎ গোপাদিত্য মন্দির প্রতিষ্ঠা বা সংস্কার করার বহু পূর্বে এই স্থানে একটি বৌদ্ধ-বিহার ছিল। সম্রাট অশোকের পুত্র জলৌক এই বৌদ্ধ-বিহারটি প্রথমে ক্রোধবশত ধ্বংস করে পরবর্তী সময়ে (আনুমানিক 200CE-তে) পুনর্নির্মাণ করেছিলেন এবং নাম রেখেছিলেন কৃত্যাশ্রম বিহার (রাজতরঙ্গিণীতে জলৌক অংশে বিস্তারিত বর্ণনা আছে)। সম্ভবত জলৌকের সময়ে এই গোপাদ্রি বা শঙ্করাচার্য পাহাড়ের নাম ছিল লোকালোক পর্বত। রাজতরঙ্গিণীতে এটাও বলা হয়েছে জলৌক শ্রীনগরীতে জ্যেষ্ঠরুদ্রের মন্দিরটি ঠিক কোথায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটো বলা নেই। যদি ধরে নেওয়া যায় জ্যেষ্ঠরুদ্র ও জ্যেষ্ঠেশ্বর এক এবং অভিন্ন তাহলেও সঙ্গতরূপে প্রশ্ন আসে, তবে কি তিনি কৃত্যাশ্রম বিহারের কাছেই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? আরও প্রশ্ন, এই লোকালোক পর্বতের নাম পাল্টেই কি গোপাদিত্য এর নাম রাখেন গোপাদ্রি? সঠিক উত্তর পাওয়া আজকের দিনে অসম্ভব। এই পাহাড়টির অন্য নাম তখত্-এ-সুলেইমান (সলোমনের সিংহাসন)। কিংবদন্তী অনুসারে প্রাচীনকালে রাজা সলোমন এখানে এসে পূজা করেছিলেন। সেই জন্য মন্দিরটিকে সলোমনের সিংহাসন বলা হয়। কিংবদন্তি অনুসারে নাকি গোপাদিত্যের বাস্তুকার সুলেমনের নামানুসারে পাহাড়টির অপর নাম তখত্-এ-সুলেইমান তা বলা কঠিন।

(ক্রমশ)

সতপাল রাইয়ের শবযাত্রায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিনিধি দলের শ্রদ্ধা সমর্পণ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, উত্তরবঙ্গ প্রান্তের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মৃত দার্জিলিঙের তাকদাহ কমান্ডের কটুসে, মানেডাঁড়ার বাসিন্দা হাবিলদার সাতপাল রাইয়ের মরদেহে শ্রদ্ধা জানায়। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন সমীর কুমার ঘোষ (সহ-প্রান্ত প্রচার প্রমুখ) বিজন বর্মন, নেপালি সংস্কৃতি পরিষদের কার্যকরী সভাপতি অশোক চৌরাসিয়া। স্বয়ংসেবক উমেশ চতুর্বেদী (দিল্লি), ড. ওমপ্রকাশ যাদব (দিল্লি)। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, উত্তরবঙ্গের পক্ষ থেকে প্রয়াত সতপাল রাইয়ের মরদেহে সবাই পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বীর জওয়ানকে শ্রদ্ধা জানান। সনাতন আচার পদ্ধতি এবং পূর্ণ সামরিক সম্মানের সঙ্গে তার বাড়ির কাছে সতপাল রাইয়ের পার্থিব শরীরের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। এই শেষকৃত্যে ব্রিগেডিয়ার, জেসিও-সহ গোর্খা রেজিমেন্টের কয়েকশো জওয়ান এবং জেলা সমহর্তা (ডিএম), দার্জিলিং জেলা পুলিশ সুপার (এসপি)-সহ বহু জনপ্রতিনিধি, এনসিসি ক্যাডেট, বিভিন্ন সংস্থা, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি এবং কয়েক হাজার গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন।

প্রয়াত সতপাল রাইয়ের স্ত্রী শ্রীমতী মন্দিরা রাই ও পুত্র বিকল রাইয়ের প্রতি সঙ্ঘের প্রতিনিধিরা সমবেদনা জানান। স্ত্রী শ্রীমতী মন্দিরা ও পুত্র বিকল রাই, যিনি সেনাবাহিনীতে এখনো কর্মরত রয়েছেন, তারা জানান যে প্রয়াত সতপাল রাই গত ২১ বছর ধরে সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন এবং সেনাবাহিনী প্রধান (সিডিএস) জেনারেল বিপিন রাওয়াতের সুরক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন গত ১২ বছর ধরে। জেনারেল রাওয়াত সতপাল

রাইয়ের উপর অনেক বেশি নির্ভর করতেন।

স্ত্রী মন্দিরা রাই ও পুত্র বিকল রাই বলেন, দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গের জন্য আমরা গর্বিত। যেভাবে সারা দেশ সতপাল রাইয়ের বলিদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে এবং আজ সেনাবহিনী, প্রশাসন, বিভিন্ন সংস্থা, জনপ্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করছেন তাতে তারা আপ্লুত। প্রয়াত সতপাল রাইয়ের পুত্র সৈনিক বিকল রাইও দেশরক্ষার প্রয়োজনে নিজের জীবন উৎসর্গ করার কথা বলেন।

দিল্লিতে জেনারেল রাওয়াতের শেষ যাত্রা এবং সতপাল রাইয়ের শেষ শবযাত্রায় একই রকম দৃশ্য দেখা যায়। দিল্লির জনসাধারণ যখন রাস্তায় নেমে 'জেনারেল বিপিন রাওয়াত অমর রহে' স্লোগান দিচ্ছিল ঠিক তখন দার্জিলিঙের আকাশ বাতাস 'সতপাল রাই অমর রহে', 'ভারতমাতা কি জয়' স্লোগানে মুখরিত হচ্ছিল।

রামানুজন পুরস্কার পেলেন কলকাতার মেয়ে নীনা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ চতুর্থ ভারতীয় গণিতজ্ঞ হিসেবে রামানুজন পুরস্কারে ভূষিত হলেন কলকাতার মেয়ে অধ্যাপক নীনা গুপ্ত। নীনা ২০২১ সালের রামানুজন পুরস্কার পেয়েছেন তাঁর 'অ্যাফাইন অ্যালজেব্রিক জিওমেট্রি' এবং 'কমিউটেটিভ অ্যালজেব্রায়' দৃষ্টান্তমূলক কাজের জন্য। কেন্দ্রীয় সরকারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রক সূত্রের খবর, রামানুজন পুরস্কার পাওয়া তিনি তৃতীয় ভারতীয় মহিলা। গাণিতিক গবেষণায় নবদিগন্ত উন্মোচনের জন্য ৪৫ বছরের কম বয়সিদের রামানুজন পুরস্কার দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক গণিত ইউনিয়ন (আইএমইউ) ও ভারত সরকারের কিষান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের সঙ্গে যৌথ ভাবে এই পুরস্কার দেয় ইটালির আব্দুস সালাম আন্তর্জাতিক তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা কেন্দ্র (আইসিটিপি)। ২০১৪ সালে নীনা বীজগণিত

জ্যামিতির মৌলিক সমস্যা 'জারিস্কি ক্যানসেলেশন প্রবলেম'-এর সমাধান করেন। সেই বছরই তাঁকে ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির তরুণ বিজ্ঞানীর পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। তাঁর এই সমাধানকে বীজগাণিতিক জ্যামিতির ক্ষেত্রে অন্যতম সেরা কাজ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছিল।

খালসা হাইস্কুলের এই প্রাক্তনী আনন্দবাজার অনলাইনের বিচারে ২০২০-র 'বছরের বেস্ট' তালিকায় ছিলেন। জন্ম গুজরাটে, দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত সেখানেই পড়াশুনা। পরে বাবার সঙ্গে কলকাতায় চলে আসেন। ডানলপের খালাসা হাইস্কুলের প্রাক্তনী নীনা ছেলেবেলা থেকেই অঙ্কের পোকা। বেথুন কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর তাঁর গন্তব্য ছিল বরাহনগর আইএসআই। স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি করার পর আইএসআই-তেই অধ্যাপনা শুরু।

ভারত বিরোধী মন্তব্য করায় পাকিস্তানি নেতাকে গ্রিসের অবাঞ্ছিত ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাকিস্তানি নেতারা সর্বত্র ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য করে চলেছে। এমনই এক ঘটনায় পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ডেপুটি স্পিকার কাশিম সুরি ভারত বিরোধী মন্তব্য করেছেন ইউরোপের দেশ গ্রিসে। এ নিয়ে ইউরোপের রাজনৈতিক দল গ্রিক সলিউশন পার্টি কাশিম সুরিকে তিরস্কার করেছে। তাঁরা জানায়, ইসলামাবাদ ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের মায়ায় ডুবে আছে। এই পার্টি সরকারের কাছে দাবি করেছে, অবিলম্বে সুরিকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ঘোষণা করা হোক।

গ্রিক সলিউশন পার্টি তার বিবৃতিতে বলেছে যে, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ডেপুটি স্পিকার কাশিম সুরির সহযোগীদের খুঁজে বের করে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে। দল জানিয়েছে যে, বিশেষ করে এমন সময়ে যখন গ্রিসে জিহাদি উপাদানগুলি চিহ্নিত করা হচ্ছে, তখন এই ধরনের ইসলামিক বক্তব্য আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য সরাসরি হুমকি।

গ্রিক পার্টি বলেছে, এই ধরনের মৌলবাদী ভাষণ একটি ঘৃণাত্মক বক্তৃতা যা বন্ধুত্বপূর্ণ ভারতের সঙ্গে গ্রিসের সম্পর্ককে বিপন্ন করতে পারে। এটা বেআইনি। দল বলেছে, সুরি গ্রিসে বসবাসকারী তার দেশের নাগরিকদের গ্রিসের মাটিতেই একটি সংগঠিত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। এরফলে ভারতের বিরুদ্ধে ঘৃণার পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। বিশেষ করে এমন সময়ে যখন পাকিস্তানের জাতিগত গোষ্ঠীগুলি এই অঞ্চলে নির্বিচারে অমুসলমানদের হত্যা করছে।

পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ডেপুটি স্পিকার কাশিম সুরির বিবৃতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করে গ্রিসের দল বলে, যখন পাকিস্তানে মৌলবাদী সংগঠনগুলি নিজেরাই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নির্বিচারে হত্যা করছে, অন্যদিকে তখন পাকিস্তানি নেতারা ভারতের বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক বক্তব্য দিচ্ছেন। এই নেতাদের তাদের নিজের বিবেককে প্রশ্ন করা উচিত। গ্রিক আর চোখ ফেরানোর ভান করতে পারে না।

প্রধান গ্রিক রাজনৈতিক দল সুরির বক্তব্যকে গ্রিক জাতীয় নিরাপত্তার জন্য সরাসরি হুমকি বলে অভিহিত করেছে।

মালদায় ভয় দেখিয়ে ধর্মান্তরণ দুই হিন্দুকে

সংবাদদাতা॥ মালদা জেলা-সহ মুর্শিদাবাদ ও দুই দিনাজপুরে লাভ জেহাদের ঘটনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবারে মালদা জেলার কালিয়াচকের মোথাবাড়িতে দুই হিন্দু শ্রমিককে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার অভিযোগে জেলাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বর্তমানে এই দুই শ্রমিকের পরিবার ও গ্রামবাসীরা অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। ঘটনার সূত্রপাত গত ২৪ নভেম্বর। বুদ্ধু মণ্ডল ও গৌরাঙ্গ মণ্ডলের স্ত্রী অনেক রাত হলেও তাদের স্বামীরা বাড়ি ফিরে না আসায় স্থানীয় রাজমিস্ত্রিকে ফোন করে জানতে চায় তারা কোথায় আছে। তারা উত্তরে জানায় অনেকক্ষণ হলো বাড়ি চলে গেছে। কিন্তু সেদিন বুদ্ধু মণ্ডল ও গৌরাঙ্গ মণ্ডল বাড়ি ফিরে না আসায় পরদিন তারা মোথাবাড়ি থানায় অভিযোগ জানাতে যায়। অভিযোগ, থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার অভিযোগ গ্রহণ না করে একজন সিভিক ভলেন্টিয়ারকে দিয়ে সেটি ছিঁড়ে ফেলেন এবং বলেন, আমাদের কাছে খবর আছে, তোমাদের স্বামীরা মুসলমান হয়ে গেছে, এখন আমাদের কিছু করার নেই। তারপর তারা কালিয়াচক থানায় গেলে সেখান থেকেও তাদের কোনো অভিযোগ নেওয়া হয়নি। তখন স্থানীয় কয়েকজনের সহায়তায় পুলিশ সুপারের নিকট অভিযোগ দায়ের করেন।

গত ২৬ নভেম্বর জেলা পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ জমা করার পর দুই শ্রমিককে মোথাবাড়ি থানায় আনা হয় এবং নিয়ম অনুযায়ী তাদের আদালতে তোলার কথা। কিন্তু দেখা যায় মৌলবি ও কয়েকজনের সহায়তায় ওই দুজন শ্রমিককে আদালতে না উঠিয়ে একজন এডিএমের নিকট এফিডেফিডে নিজেরা স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়েছে বলে জানায় এবং তারপর সেখান থেকে নিজেদের বাড়ি নিয়ে যায়। গত ১৭ ডিসেম্বর কিসমত মদনপুর গ্রামে গিয়ে দুই শ্রমিকের বাড়িতে তাদের পরিবারের লোকজনকে সঙ্গে কথা বলে মুসলমান হওয়ার রহস্য জানা যায়।

বুদ্ধ মণ্ডল ও গৌরাঙ্গ মণ্ডল দীর্ঘদিন ধরে হাবিব শেখ ও মুন্সটোলার রবিউল শেখের সঙ্গে রাজমিস্ত্রির কাজ করতো। তাদের রাস্তার ধারেই ১০ কাঠা জমিতে একটি বাড়ি রয়েছে। সেই বাড়ি ও জমি হস্তগত করার জন্যেই মগজ ধোলাই করে তাদের ধর্ম পরিবর্তন করানো হয়েছে বলে অভিযোগ।

ওই দিন গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বছর কয়েক আগে এই পরিবারের ৫ বিঘা জমি ধারলা গ্রামের নুরুল শেখ কৌশলে দখল করে নিয়েছে। মুসলমান অধ্যুষিত এই গ্রামটিতে এখন থমথমে পরিবেশ রয়েছে। গ্রামবাসীরা জানায় তারা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। বিশেষ একটি সূত্রে জানা যায়, মালদা জেলা জুড়ে একটি জেহাদি সংগঠন এভাবে ধর্মান্তরকরণের কাজ করছে।

বিশেষ আবেদন

ঈশ্বরের আশীর্বাদে ও সকলের সহযোগিতায় ৭৪ বছর ধরে স্বস্তিকা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। স্বস্তিকা নিরপেক্ষ নয়, রাষ্ট্রীয়তার পক্ষে। রাষ্ট্রবাদী মানুষ হিসেবে আপনি যে কথা জানতে চান, স্বস্তিকার পাতায় আপনি তা পাবেন।

বাজার চলতি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যেখানে দেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ থাকে না, অন্যান্য লেখার ভিড়ে আসল তথ্যটাই যেখানে হারিয়ে যায়, স্বস্তিকা সেখানে সত্যটাকেই তুলে ধরে। স্বস্তিকার লেখায় তখন আপনি মনের কথাটি খুঁজে পাবেন। এক কথায়, স্বস্তিকা জাগ্রত হিন্দু চেতনার তথা ভারতাত্মার কণ্ঠস্বর।

সর্বভারতীয় রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক হাল-হকিকত এবং প্রকৃত চিত্রটি জানতে হলে স্বস্তিকা পড়তে হবে। স্বস্তিকার প্রতিটি সংখ্যাই বিষয়, বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। ভারতের পরম্পরা ও আধুনিকতার এ এক অসাধারণ মেলবন্ধন। পরিবারের সবার সঙ্গে বসে পড়ার মতো পত্রিকা।

এবছর স্বস্তিকা ৭৫ বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে। এই উপলক্ষ্যে পক্ষকালব্যাপী স্বস্তিকার গ্রাহক সংগ্রহ অভিযানের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২, মঙ্গলবার এই গ্রাহক অভিযানের সূচনা। ৫০০ টাকা দিয়ে আপনিও স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহক হোন— এটাই আমাদের অনুরোধ। পূজাসংখ্যা-সহ এক বছরে প্রকাশিত স্বস্তিকার সব সংখ্যাই আপনি বার্ষিক গ্রাহক হিসাবে পাবেন। স্বস্তিকা আপনার সহযোগিতা ও শুভেচ্ছার প্রত্যাশী।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে স্বস্তিকার ২৪ জানুয়ারি ২০২২ তারিখের সংখ্যাটি 'স্বাধীনতা-৭৫' বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হবে। এজন্য বিজ্ঞাপনদাতাদের স্বস্তিকা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে পত্রিকার শ্রীবর্ধনের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

বিজ্ঞাপনের রেট
প্রতি কলাম সেন্টিমিটার (কালো/সাদা) ১৫০্ টাকা
প্রতি কলাম সেন্টিমিটার (রঙিন) ২২৫্ টাকা

যোগাযোগ : জয়রাম মণ্ডল :
৮৬৯৭৭৩৫২১৫, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪
বিজ্ঞাপন পাঠানোর শেষ তারিখ :
১০ জানুয়ারি, ২০২২

With Best Compliments from :

A

WELL WISHER

।। চিত্রকথা।। শ্রীগুরুজী।। ১৮।।

কিছু মাস আগে স্বামী অখণ্ডানন্দজী (রামকৃষ্ণ মিশনের সারগাছি আশ্রমের প্রধান) নাগপুরে এলেন।

স্বামীজী আমাদের শিষ্য করে নিন।

সারগাছি ঘুরে দেখ, চিন্তা করব।

স্বামী ভাস্করেশ্বরানন্দজী গুরুজীর একাগ্রতার কথা স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে লেখেন।

প্রফেসর এম এস গোলওয়ালকর সারগাছি আশ্রম দেখতে চান। তাঁকে তোমার কাছে পাঠাবো।

সারগাছি থেকে অনুমতি এসেছে। গুরুজী এবিষয়ে শুধু তাঁর দুই বন্ধুকে বললেন। বাবা-মায়ের জন্য তিনি চিঠি রেখে গেলেন। তাঁর অন্ধ বন্ধু স্বলারাম এবং তার স্ত্রী গুরুজীকে দুশো টাকা হাতে দিলেন।

গুরুজী সারগাছি আশ্রম পৌঁছলেন।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। সবাইকে মিষ্টি দাও।

দীপাবলী কালীপূজার আয়োজন চলছে। আরও আয়োজনের জন্য স্বামী অখণ্ডানন্দজী স্বামী নিরময়ানন্দজীকে ডাকলেন।

তুমি পুজো করবে। গোলওয়ালকরকে সঙ্গে নিও।

সারারাত পুজো হবে। শীতের রাত। গুরুজী বাসনগুলো ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে ফেললেন।

চলবে